সরীসৃপ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড়টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সূচীপত্র

সরীসৃপ

মহাজন

গ্রামের কোন বৌ যথন বলে, 'তোমারই পথ চেয়েছিলাম', পথ সম্বন্ধে তখন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঁধান পাকা রাস্তা কাঁচামাটির আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণ পল্লীপথে পরিণত হওয়ার উপক্রম করে। দুপাশে দেখা দেয় ঝোপঝাড় ডোবাপুকুর, জীর্ণ খড় অথবা শণে ছাওয়া বাড়ী-ঘর —একটি মেয়ের ঘোমটা ফাঁক করিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিবার ফলে চারিদিকের আবহাওয়াই যেন বদলাইয়া যায়। পথটি দিয়া মোটর চালান যায় না, পথের দুদিকে কতকটা আধুনিক ফ্যাশনের পাকা দালান খাড়া করা যায় না, যে চোখ দুটি দিয়া বৌটি পথের দিকে চাহিয়া ছিল (চাহিয়া ছিল কিনা ভগবান জানেন, হয়ত সমস্ত দিনটা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল,—'তোমার পথ চেয়ে ছিলাম গো!'— যাকে বলিতে হয় সে যে রাত্রিটা ঘুমাইতে দিবার পাত্র নয় এটুকু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা গ্রামের বৌদেরও থাকাটা অস্বাভাবিক নয়) সে চোখে একজোড়া চশমা আমদানী করাটাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

তবে বলিয়া দিলে সকলেরই বিশ্বাস করা উচিত যে, বাঙ্গা গ্রামের বৌ, প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল লম্বা বাঁধান রাস্তার ধারে গ্রামেরই দোতালা পাকা দালানে তার বাস, ঘুমানো দূরে থাক সারাদিন সে পাঁচ মিনিট চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়াছে কিনা সন্দেহ এবং সত্যসত্যই একজনের পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে।

কখনও সদর দরজায় দাঁড়াইয়া চাহিয়াছে, কখনও জানালার শিকের ফাঁকে চাহিয়াছে, কখনও আলিসাহীন ছাদে দাঁড়াইয়া চাহিয়াছে। পথ ছাড়া আর যা কিছু দেখিবার আছে, কিছুই দেখিতে বাদ দেয় নাই। তবে সে একরকম মূল্যহীন দেখা। অনেকদিনের অতি পরিচিত আবেষ্টনী। চোখের সঙ্গে এমন অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে, নূতনত্ব সৃষ্টিই হইতে পাবে না। যে দু'একখানা নতুন ঘরবাড়ী উঠিয়াছে, যে ঘরবাড়ীর সংস্কার হইয়াছে, যেখানে বন সাফ হইয়াছে, যেখানে গাছপালা নিবিড়তর হইয়াছে, যেখানে মাঠের খোলা বুক ফসলে ভরিয়া গিয়াছে, যেখানে শুকনো জমিতে জল জমিয়া আয়নার মত ঝকঝকে জলা হইয়াছে,—তার চোখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্ম কোথাও যেন আকস্মিকতা আমল পায় নাই, সমস্ত পরিবর্ত্তনের পিছনে তার শুভদৃষ্টির অনুমোদন লাগিয়া আছে।

এই ব্যাপারটাই আগাগোড়া কেমন খাপছাড়া লাগে। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এসব কি চলে মেয়েমানুষের! বাহিরটা ভিতরে চলিয়া আসিবে, এ বয়সে এটা আর ঠিক মানায় না, উচিত হয় না, প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কপালে ত্রিশ বছরের সিঁদূরের ফোঁটাটা একবারও চড়চড না করিলে যেমন অন্যায় হয়, এও কতকটা সেইরকম বই কি। সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে, চারিপাশের জগৎকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভিতরে আনা, তুচ্ছতম পরিবর্ত্তনকে পর্য্যন্ত সূচনা হইতে চিনিয়া

রাখা। দশটা দিক তার জগতের, দশ-প্রহরণের বৈচিত্র্য। চেতনাকে অবশ করিয়া রাখা মহাপাপের সামিল নয় কি? বিশেষতঃ আজ যখন একজনের আসিবার কথা ছিল? আজ যখন সে একজনের পথ চাহিয়া আছে?

আবেগ বাঙ্গার অতি অভ্যস্ত অনুভূতি—চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পর্য্যন্ত। আবেগের আতিশয্যে প্রায় প্রত্যেক দিনই কয়েকবার কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝিম-ঝিম করে। এতদিন এজন্য বিশেষ কোন ভাবনা ছিল না, এতবড় বাড়ীতে এত কম লোকের মধ্যে এত কম কাজ করিয়া দিন কাটাইতে হইলে মাঝে মাঝে আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া মাথাটা ঝিম-ঝিম করিলেই বরং আরাম লাগে, কিছুক্ষণের জন্য ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব ভোঁতা হইয়া যায়,—কিন্তু এবার কদিন আগে হঠাৎ একটা দুর্ভাবনা গজাইয়া উঠায় বিপদ হইয়াছে। চুলে নাকি বাঙ্গার পাক ধরিয়াছে এইজন্য,—এরকম আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া মাথা ঝিম-ঝিম করিতে থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই নাকি তার চুল পাকিয়া যাইবে। বুড়ী হইয়া পড়িবে বাঙ্গা। হায়, চুয়াল্লিশ বছর বয়স হইয়াছে বাঙ্গার, চুল পাকিয়া বাঙ্গা বুড়ী হইয়া যাইবে!

বাঙ্গা নিজেই এটা আবিষ্কার করিয়াছে। কয়েকদিন আগে করুণার বৌকে সে এই বলিয়া বকুনি দিয়াছিল: 'বিইয়েছিস তো বাছা একটা মোটে মেয়ে, লজ্জা-সরম নাই বা এরমধ্যে ভাসিয়ে দিলি? যাক না আর দুটো দিন? হোক না আর দুটো একটা বাচ্চা-কাচ্চা?'

করুণার বৌ জবাব দিয়াছিল: 'বেশী কাচ্চা-বাচ্চা না হলে বুঝি বুড়ো বয়েস পোয্যোস্তো কনে বৌটি সেজে থাকতে দিদি?'

'কি বললি?'

'বলিনি কিছু, জিগ্‌গেস করছি। তোমার একটির বেশী কাচ্চা-বাচ্চা হয়নি তো, মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু যে কনে বৌটির মত লজ্জা-সরম রেখে চলেছ এটা সেইজন্য কি-না, তাই জিগ্‌গেস করছি। জিগ্‌গেস করলে তো দোষ নেই দিদি? তোমায় জিগ্‌গেস না করলে কাকেই বা জিগ্‌গেস করব বল? তুমি হলে গিয়ে, কি যেন বলে, সব জান্তা।—'

চুলে পাক ধরিয়াছে? ধরুক। স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক বয়সে পাক ধরিয়া সমস্ত চুল শণের নুড়ি হইয়া যাক। কিন্তু মন কেমন করিয়া মাথা ঝিম-ঝিমানির জন্য অসময়ে মাথার চুল সাদা হইবে কেন? সে কি বরদাস্ত হয় মানুষের? কে জানিত মাথা ঝিম-ঝিম করার এমন একটা কুফল আছে!

কপাল পোড়া, তাই অসময়ে জানিতে হইল। এতকাল না জানিয়া কাটিয়াছিল, আরও কয়েকটা দিনও না হয় কাটিত। বছরে চারটি দিনের জন্য বিধুশেখর বাড়ী আসে, তার ঠিক কয়েকটা দিন আগে এমন চাঞ্চল্য-কর জ্ঞান নাই বা জুটিত। বিধুশেখর ফিরিয়া যাওয়ার পর জুটিলে জ্ঞানটা নাড়াচাড়া করার সময় পাওয়া যাইত একটা বছর। এক বছরে নূতনত্ব ঘুচিয়া যাইত জ্ঞানের, আর চঞ্চল করিতে পারিত না। বছরে চারদিনের জন্য যে স্বামীকে কাছে পায়, দুর্ভাবনা দিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করা তার পক্ষে মহাপাপ। অন্ততঃ স্বামী তো একটা মারাত্মক ভুল-বোঝা বুঝিয়া ফেলিবার সুযোগ পাইবে। মনে তো করিয়া বসিবে যে বৎসরান্তে চারদিনের জন্য স্বামীকে কাছে পাইয়াও অন্যবারের মত বৌটা খুসী পর্য্যন্ত হয় নাই, মুখটা হাঁড়ি করিয়া আছে। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া হয় তো ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, এমন বৌয়ের কাছে বছরে চারদিনের জন্যও আর তবে আসিয়া কাজ নাই! ব্যস, আর আসিবে না। দিন

কাটিবে মাস কাটিবে বছর কাটিবে, স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গার চুল সাদা হইয়া আসিবে, চামড়া লোল হইয়া পড়িবে, কোমর বাঁকিয়া যাইবে,—বিধুশেখর আসিবে না। বছরে চারিদিনের জন্যও আসিবে না, একদিনের জন্যও আসিবে না। ত্রিশ বছরের নিয়মটা ভাঙ্গিয়া যাইবে। না মরিলেও দুজনের প্রত্যেকের মনে হইবে, হয় সে নিজে নয় অপর জন মরিয়া গিয়াছে।

পূজার সময় চারদিনের জন্য বিধুশেখর বাড়ী আসে। কবে আসে সেটা নির্দ্দিষ্ট থাকে না, কোন বছর পূজার দুদিন আগেই আসিয়া পড়ে, কোন বছর পূজার মধ্যে কোন একটা দিন আসিয়া হাজির হয়। গুনিয়া গুনিয়া চারিটি দিন যে থাকে তাও নয়। কোনবার একদিন কমও থাকে কোনবার একদিন বেশীও থাকে। চারিদিনের হিসাবটা বাঙ্গার ত্রিশ বছরের গড়পড়তায় হিসাব—এ হিসাব বাঙ্গার একেবারে নিজস্ব। বছরে চারদিনের জন্য স্বামীকে কাছে পাইবে বাঙ্গার এই আশা, ভরসা ও বিশ্বাস—নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে ধারণা। বছর ভরিয়া এটা কল্পনার কাজে লাগে। বিধুশেখর একদিন কম থাক আর একদিন বেশী থাক সেজন্য কিছু আসিয়া যায় না, ওটা সাময়িক লাভ লোকসানের ব্যাপার।

'মোটে তিনদিন থাকবে এবার?'

এই কথাটা বলিবার সময়টুকুর মধ্যেই প্রায় বুকটার ধড়াস ধড়াস সামলাইয়া অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আবিষ্কার করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিতে পারে—নিজের ব্যথা ভুলিয়া স্বামীকে দরদ দেখানোর কর্ত্তব্য পালন করিতে আর স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য তার যে আনন্দের সীমা নাই এই ভাবটা আবার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে বড় জোর আরও ততটুকু সময় লাগে। বাস্, যেমন বাঙ্গা ছিল, আবার

তেমনি বাঙ্গা,—দীর্ঘ বিরহের অবসানে বুড়া বয়সেও মেয়েমানুষের যতটা আনন্দে ডগমগ হওয়া উচিত তার চেয়ে বোধ হয় বেশী ডগমগ বাঙ্গা !

'পাঁচদিন থাকবে ? সত্যি ?'

বলিয়া খুসিতে ছোট মেয়েটি বনিয়া যাওয়া তো আরও সহজ ব্যাপার, আরও কম সময়ের কাজ।

এবার সপ্তমীর দিনটাও পথ চাহিয়া কাটিয়াছে। বিধুশেখর আসে নাই। অন্য বছর এটা অসাধারণ ঠেকিত না। আজ আসে নাই, কাল আসিবে। কেবল একটা দিনের এই-আসে-এই-আসে-প্রতীক্ষার ব্যর্থতা, পরদিন আরও বেশী অধীরতার সঙ্গে প্রতীক্ষা। কিন্তু এবার ব্যাপারটা আগাগোড়া কেমন যেন থাপছাড়া। কোনবার আসিবার আগে বিধুশেখর পত্র লেখে না, এবার আগেই লিখিয়া জানাইয়াছে, সপ্তমীর দিন আসিয়া পৌছিবে। সপ্তমীর দিন না-আসাটা তাই অনন্যসাধারণ ঘটনার পর্য্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে।

করুণা বলিয়াছে, 'আসবেন লিখে এলেন না—এতো ভারি আশ্চর্য্যি ! নয় বৌঠান, আশ্চর্য্যি নয় ? দাদার বেলা তো এমন হয় না !' বাঙ্গা বলিয়াছে, 'কেন হবে না, হয়। ওঁর কি কথার ঠিক আছে ?' করুণার বৌ ফিসফিস করিয়া বলিয়াছে, 'কথার ঠিক আছে, মাথার ঠিক নেই। মাথা বেঠিক বলেই না তিরিশ বচ্ছর চুলচিরে কথার ঠিক থেকেছে।'

'কি বল্‌লি ?'

'বললাম, কোন কাজে হয় তো আটকে গেছেন কাল আসবেন।'

'আর এসেছে। আসবে লিখেছে যখন, আর কোনদিন আসবে না। জীবনে কোনদিন আসবে না বলে চলে গিয়েছিল কি না, তাই প্রতি বছর এসেছে। এবার আসবে লিখেছে কি না, আর আসবে না।'

এই ক্ষুব্ধ আলোচনার জেরটা কাটিয়া যাওয়ার আগেই বিধুশেখর আসিয়া হাজির হয়। অসময়ে, বিনা সংবাদে, একেবারে আলোচনা-সভার মাঝখানে। আলোচনাটা তখন বাঙ্গাকে প্রায় কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছে। অন্যবারের মত তাই হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগটা এবার বাঙ্গার ফস্কাইয়া গেল। বিধু আসিয়া ছাখে কি, এবার বাঙ্গার মুখের ভঙ্গিটা বড় খাপছাড়া, বেশভূষাটা বড় বেমানান। গায়ে সেমিজ থাকা দূরে থাক, পরণের কাপড়টাও ময়লা। মুখে হাসি থাকা দূরে থাক, চোখ ঠাসা জল। স্বামী যেন এবার বাঙ্গার আসিয়াও আসে নাই।

সবচেয়ে বিপদের কথা, এবার বাঙ্গার আত্মসংযম নাই। গত বছর বাঙ্গার বয়স ছিল প্রায় তেতাল্লিশ, কি গভীর আত্মসংযমে গত বছরও নিজেকে সে যুবতী করিয়া রাখিয়াছিল! এবার দিদিমার মত বুড়ী সাজিয়া অসংযমের চরম করিয়া ছাড়িল। চোখ পাকাইয়া বিধুর দিকে চাহিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'কেন এলে আজ? কাল আসবে লিখে আজ এলে কেন শুনি? আরে আমার সাতজন্মের ভালবাসার ভাতার! কাল আসবেন লিখে আজ এসেছেন পিরীত করতে!'

এ বজ্রপাতের সামিল। হাতের স্যুটকেশটা মাটিতে ফেলিয়া বিধু ব্রজাহতের মত তার উপরে বসিয়া পড়িল। একটা বজ্রপাত করিতেই বাঙ্গার সমস্ত বিদ্যুৎ খরচ হইয়া গিয়াছিল, মেয়েমানুষের বিদ্যুৎ আর জীবনশক্তি এক জিনিষ, বাঙ্গাও তাই যেন হঠাৎ মরিয়া গেল। বোকার মত জিভ্ কাটিয়া প্রথমে বলিল, 'ছি!',—তারপর চারদিকে উদভ্রান্তের মত চাহিয়া বলিল, 'কি বললাম?'

বিধু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার শরীর ভাল নেই?'

চুলের প্রায় তিনভাগ সাদা বিধুর, বয়স তো গিয়াছে ষাটে। তা ছাড়া শরীরটাতে ধরিয়াছে ভাঙ্গন। ত্রিশ বছর আগে এরকম মুখ করিয়া এত দরদের সঙ্গে এরকম একটা প্রশ্ন করা চলিত, এখন আর চলে না। করুণা, করুণার বৌ, করুণার মেয়ে আর বাঙ্গা চারজনেরই সর্ব্বাঙ্গে তাই রোমাঞ্চ দেখা দিল। করুণার মেয়ের কোলের আড়াই বছরের শিশুটা পর্য্যন্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটা দুর্ব্বোধ্য ভয়ানক কিছুর আবির্ভব টের পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মোটের উপর অবস্থাটা দাঁড়াইয়া গেল কুৎসিৎ। প্রাণাধিকের মৃতদেহটা জড়াইয়া ধরিয়া একটু বেহিসাবী রকমের বেশী সময় কাঁদাকাটা করার পর নাকে পচা গন্ধ লাগিতে আরম্ভ করিলে যেমন বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রকাব্যের চোলাই-খানার দেশে তামাসা করাটা সব অবস্থাতেই সোজা এবং নিরাপদ। করুণার বৌ তাই মেয়ের কোল হইতে মেয়ের ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেকে নিজের কোলে নিয়া তার হাঁ করা মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, 'বলনা খোকন তোর দাদুকে, তুমি এসেছ দাদামশাই এবার দিদিমার শরীল ভাল হবে, সম্বচ্ছর কেঁদে কাটালে শরীল খারাপ হবে না একটু?

বাঙ্গা বলিল, 'কি বেহায়াপানা করিস! সম্বচ্ছর কেঁদে কাটাই না তোর মাথা।'

মুখে হাত চাপা দেওয়ায় খোকনের ফাঁপর লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, তবু করুণার বৌ হাত সরাইল না। মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'আমার কাছে কি লুকোনো আছে দিদি, কত রাত কেঁদে কাটাতে দেখেছি!'

'তোর মাথা দেখেছিস, বেহায়া বজ্জাত মাগি! ছেলেটাকে মারবি না কি অ্যাঁ?'

করুণার বৌ-এর কোল হইতে ছেলেটাকে বাঙ্গা ছিনাইয়া নিল। এঘরে আর থাকা চলে না। পাশের একটা ঘরে গিয়া বিছানায় বসিয়া নাতিকে কোলে করিয়া চুপি চুপি কাঁদিতে লাগিল। নাতির গগনভেদী আর দিদিমার মৃদুল কান্নার সমন্বয় এবাড়ীতে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি করিল বৈ কি আজ। পূজার বাজনা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল, কয়েক মাইল দূরের গ্রামগুলিতে যেমন বন্যার জলে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া যাইবার মত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়া গিয়াছে পূজার উৎসবটা সেই রকম মানুষের জীবনটা নিরানন্দে ভরিয়া দিতেছে।

এঘরের জানালা দিয়া পথ দেখা যায়। আর দেখা যায় পথের ওদিকের সাড়ে তিনটা কাঁচাপাকা বাড়ী। মাঝখানের বাড়ীটার একটা ঘরের জানালা প্রায় এই জানালাটার প্রতিফলিত ছবির মত। রাখাল দাসের ছবির মত সেজ মেয়ে টুনুর ঘর বলিয়া জানালাটায় কেবল একটা পর্দ্দা আছে,—তবে আধখানাই প্রায় ছেঁড়া। সকাল বেলাই খবর পাওয়া গিয়াছিল আজ টুনুরও জামাই আসিয়াছে। এখন দেখা গেল, শুধু আসে নাই, সশরীরে আসিয়াছেন। বেলা বারটার সময়েও টুনু জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়ান মাত্র শরীরটা অনায়াসে এবং হয়ত অকারণে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে না—টুনুর কৌতূহলেরও যেন আর ক্ষণিকের স্বাধীনতা নাই, বাহিরের জগৎকে একটু দেখিয়া লইতে জানালায় আসিলেও তাকে লজ্জা দেওয়া চাই।

অথচ টুনু সঙ্গেই যাইবে—তিনটা কি চারটা দিন পরে। ছমাস আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে, এবার টুনু সঙ্গেই যাইবে। অন্ততঃ ছ'মাসের জন্য

সঙ্গে যাইতেই হইবে। গন্তব্য স্থানটা এতদূর আর টুনুর বয়সটা এত কম যে ছ'মাস ধরিয়া টুনুর এই সঙ্গে যাওয়ার কথাটা ভাবিতে গেলেই বাঙ্গার বুক কাঁপিয়াছে, মাথার ঝিমঝিমানি বাড়িয়া গিয়াছে।

আজ এত সব কাণ্ডের ঠিক পরেই পর্দ্দা-ছেঁড়া জানালার ফাঁকে টুনু আর নবাগতকে এক সঙ্গে দেখিয়া ফেলার ভিতরে একটা বড় রকমের প্রলয় ঘটিয়া গেল। বিকালেও আগের মত হওয়া গেল না, পরদিনও গেল না।

এতদিনের সাধনা, এতদিনের অভ্যাস, ভবিষ্যতের ভাবনা কিছুই কাজে লাগিল না বাঙ্গার। বাঙ্গা কোনমতেই স্বামীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করিতে পারিল না।

বিধু কতকটা নীরব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই তার পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করিয়া গেল। কিন্তু সেও যে কিরকম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে, প্রকাশ পাইতে বাকী থাকিল না। বিধুর দাড়ি-গোঁপ ভয়ানক কড়া, খুব ভাল করিয়া চাহিবার পরও হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন নিষ্ঠুরতার একটা প্রকাশ্য আবরণ। এই রকম মুখে দুর্ভাবনার সঞ্চার হওয়ায় বাঙ্গার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে অবশ হইয়া আসিল। ভয়ে ভয়ে শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, 'গ্যাখো, আমার শরীলটা সত্যি ভাল নেই। দুদিনের জন্য এলে আমি এরকম ব্যবহার করছি বলে কিছু যেন মনে করো না তুমি, কেমন?"

'না, কিছু মনে করিনি।'

'এতবার এসেছে, কোনবার আমার মুখ ভার দেখেছ?'

'না, তা দেখিনি।'

'এবার হাসিখুসী থাকতে পারছি না—কি যেন হয়েছে। হবে আর কী, শরীলটা ভাল নেই। এবারটি আমায় মাপ করবে না?'

এ এক ধরণের প্রেমালাপ। দিনের বেলা ঘরের বারান্দায় সকলের চোখের সামনে বসিয়া নাতিকে কোলে করিয়া এ ধরণের গভীর ও তীব্র আবেগ-ভরা প্রেমালাপ করিতে হয়। আড়ালে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া এসব প্রেমালাপ চলে না, তার মত বেহায়াপণা আর নাই। দুজনের বয়স এখন অনেক পিছাইয়া দিলে, নাতিকে বহুদূর ভবিষ্যতে সঞ্চিত করিলে, বাঙ্গাকে টুনুর মত হাল্কা ছিপছিপে একটি নববিবাহিতা মেয়ে, আর বিধুকে টুনুর জামায়ের মত ফিটফাট নববিবাহিত ছেলে করিয়া দিলে, দুজনের এই চমৎকার মানানসই প্রকাশ্য প্রেমালাপ যেমন অকথ্য বেহায়াপণায় দাঁড়াইয়া যায়, আড়ালে এই প্রেমালাপ তেমনি বেহায়াপণা। এমন জটিল মানুষের জীবনের এই দিকটা!

পূজা গেল। বিধু গেল না। বলিল, 'এই যাব আজকালের মধ্যে। দুটো দিন থাকি।'

অন্যবার এই কথায় বাঙ্গার আনন্দে পাগলামি করার কথা, এবার তার শ্রান্ত চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল। টুনু একজনের সঙ্গে সেইদিন কয়েক ঘণ্টা আগে চলিয়া গিযাছে, শুধু এজন্য অবশ্য নয়, অন্য কারণও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কারণগুলিই প্রধান কারণ। সেইজন্য পাগলামি সে করিল অনেক রকম, কিন্তু আনন্দে পাগল হইতে পারিল না। কেবল টুনুর জন্য চোখে জল আসিলে সে অনায়াসে স্বামীর আরও দুটো দিন থাকিবার কথা শুনিয়া মুখে হাসি-কান্নার শোভা ফুটাইয়া স্বামীকে দেখাইতে পারিত। চাবির গোছাটায় অসঙ্গত আওয়াজ তুলিয়া বলিতে পারিত, 'সত্যি আরও দুটো দিন থাকবে? বল কি গো! এবার কোন্-দিকে সূয্যি উঠছে দেখতে হবে তো!"

বিসর্জ্জনের দশমীর পরের পূর্ণিমা আসিল, তবু বিধুশেখরের যাওয়ার

লক্ষণ দেখা গেল না। বছরের পর বছর, কেবল চারদিনের জন্য বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার, কিন্তু বিধুশেখর আসা-যাওয়ার মধ্যে হাঙ্গামা ঢুকিতে দেয় না, যন্ত্রের মত আসে, যন্ত্রের মত চলিয়া যায়। যেন দৈনন্দিন সাধারণ কাজ—আপিসে যাতায়াতের মত। এবার আসিয়াছে সে যন্ত্রের মত, যাওয়া সম্পর্কে এরকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় সকলে অবাক হইয়া গেল। একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, যখন বাড়াবাড়িটা দাঁড় করাইয়া দিল অবিশ্বাস্য নাটকীয়তায়।

আরও তিনদিন বাঙ্গার চাল-চলন লক্ষ্য করিবার পর বলিল, 'ত্যাখো তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে যাবে?'

ত্রিশ বছর পরে এ প্রশ্ন বুঝিতে সময় লাগে। বাঙ্গা কিছু বলিল না।

'এবার তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। বুড়ো হলাম, কবে আছি কবে নেই—

বাঙ্গা দুচোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'তুমি আমায় সঙ্গে নিযে যাবে? আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকবো?'

'যদি তুমি রাজী হও। আমি ভাবছিলাম কি, কবে কি হযেছিল সেজন্য এতকাল তুমিও কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পেলাম, এবার বাকী কটা দিন—'

বাঙ্গার মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। সে সংক্ষেপে বলিল, 'তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে।'

বিধু বলিল, 'কি বললে? অনেকদিন বাঁচব? বাঁচাবাঁচির কথা পরে হবে, তুমি রাজী তো?'

'রাজী নই? ওগো আমি যে সারাবছর তোমার জন্য কাঁদি আর পথের পানে চেয়ে দিন কাটাই।'

গ্রাম্য মেয়ে এভাবে পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটানর কথা বলিলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব না হইয়া পারে ?

বিধুশেখরের কামান কড়া দাড়িগোঁপের নিষ্ঠুর আবরণে ঢাকা মুখ হঠাৎ এমনভাবে বিকৃত হইয়া গেল যে, দেখিলে ভয় হয়। রাগে আগুন হইয়া সে বলিতে লাগিল 'সারা বছর কাঁদ! পথের পানে চেয়ে দিন কাটাও! এতদিন বলতে পারনি এ কথাটা? এতকাল কাঁদতে পারনি একটু? সারা বছর আশায় আশায় থেকে বাড়ী ফিরতাম, চৌকাটে পা দিতে না দিতে একগাল হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে, যে কটা দিন থাকতাম, কি স্ফূর্ত্তি, কি সব হাসি-তামাসা, হৈ চৈ ব্যাপার! কি করে জানব তুমি সারা বছর কাঁদতে? কি করে জানব তুমি পথের পানে চেয়ে দিন কাটাতে? শুণতে তো জানি না আমি!'

চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিযাছিল, ছেলে কোলে করুণার মেয়ে পর্য্যন্ত। কিন্তু বাঙ্গা কারও দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, 'আগে জানলে আমায় নিয়ে যেতে?'

বিধুশেখর আরও রাগিয়া বলিল, 'যেতাম না? নিয়ে যাবার জন্তই তো এসেছি প্রত্যেকবার। তোমার রকম সকম দেখে ভড়কে যেতাম। আমায় ছাড়া যে অমন স্ফূর্ত্তিতে থাকতে পারে, তাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বলতেই সাধ হত না।'

কত পাগলামিই মানুষ জানে! এসব কাণ্ড-কারখানা দেখিলে মনে হয় না, মানুষের পক্ষে ভাব-প্রবণতা মহাপাপ, যে মানুষ হাসির পিছনে কান্না, আর কান্নার পিছনে হাসি খুঁজিয়া পায় না—ত্রিশ বছর সন্ধান করিয়াও পায় না? বিশেষতঃ, কয়েকজন কবি পৃথিবীর মানুষের জন্ত কাব্য-রস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন এবং কাব্য-রসটা সব রসের সেরা

রস, এইজন্য পুরুষ মানুষের পক্ষে কবিত্ব করা আত্মহত্যার সামিল। বিধুশেখর কাব্য-রস উপভোগ করিয়াছিল, ভালই করিয়াছিল—সকলেরই করা উচিত। কবি না হইয়া কবিত্ব করিতে গেল কোন্ হিসাবে? কে আজ ত্রিশ বছরের ক্ষতিপূরণ করিবে? কোন্ মহাজনের এত ক্ষতি সহ্য হয়?

বন্যা

তারপর ভৈরবকে শেষরাত্রির দিকে একেবারে ঘরের চালায় উঠিতে হইল। আজ কতকাল এই শনে-ছাওয়া চালা তাকে সপরিবারে আকাশের কৃপণ অকৃপণ বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে, আকাশ-ফাটা রোদে যোগাইয়াছে ছায়া। এই চালার নীচে কত দিনরাত্রি কাটিয়াছে, কে জানিত কেবল তলায় নয়, একদিন রাত্রিশেষে দরকার হওয়া মাত্র উপরেও তার এমন আশ্রয় মিলিবে?

ঢালু ভিজা চালা বাহিয়া একেবারে ডগায় উঠিয়া ভৈরব পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল। এখন বৃষ্টি নাই। আকাশের একদিকে আল্‌গা মেঘ, অন্যদিক ফাঁকা। ফাঁকায় তারাও আছে, ছোট একটি চাঁদও আছে। মেঘ যেন ঘষামাজা করিয়াছে আকাশকে, বৃষ্টি যেন ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে,—কি জ্বলজ্বলে সব তারা, কি জ্যোৎস্না বিলানোর সখ অতটুকু আনমনা ক্ষয়ধরা চাঁদের!

অথচ পৃথিবী ঝাপসা, চারিদিকে ভাল নজর চলে না। চাঁদ আর তারার আলো যেন পৃথিবীর জন্য নয়, যেটুকু পায় পৃথিবী সে শুধু উপচানো দয়া। উত্তরে আমবাগানের বন, আবছা অন্ধকারের একটা এলোমেলো স্তূপ। পশ্চিমে সেই আবছা অন্ধকারই সমতল করিয়া বিছানো,—ক'দিন আগে ছিল ফসল ভরা মাঠ, এখন প্রায় নিস্তরঙ্গ জলের সমুদ্র! পূর্ব্ব আর দক্ষিণের বাড়ীগুলি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে বিশাল নিশ্চল আবছা অন্ধকারের ঢেউ।

সবগুলি বাড়ী নয়, মাঝে মাঝে মাচা আছে, কিন্তু খুব কাছের মাচাটি ছাড়া একটিকেও মাচা বলিয়া চেনা যায় না।

'আরে হোই মহিম, আছ নাকি, হেঁই?'

নিজের হাঁক শুনিয়া ভৈরবের নিজেরই চমক লাগে। এত জোরে হাঁক না দিলেও চলিত। কাছের মাচাটি হইতে মহিমের জবাব আসিবার আগে আরও দূরের সাড়া আসিল।

'ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা, একবারটি এসো ইদিকে—সর্ব্বনাশ হইছে মোর—শুনছ ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরবমামা!'

বেশ বুঝিতে পারা যায়, আলতামণির গলা। সম্পদের আলোচনায় এমন কোমল আর মনোহারী, বিপদের আর্ত্তনাদে এমন তীক্ষ্ণ আর মর্ম্মভেদী গলা রাজনগরে আর কারো নাই।

কিন্তু কোনদিক হইতে কেহ সাড়া দিল না। এমনি ভাবে রাত্রিশেষে ঘরের চালায় উঠিয়া আশ্রয় গ্রহণের আশঙ্কা থাকায় গ্রাম আগেই অর্দ্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যারা গিয়াছে তাদের বেশীরভাগ স্ত্রীলোক আর শিশু, ঘরের চালায়, মাচায়, চালের বাঁশ আর গাছের ডাল হইতে দোলনার মত ঝুলানো তক্তপোষে, অনাথদের বাড়ীর পিছনের উঁচু মাটির টিপিটায় আর ছোটবড় কয়েকটা নৌকায় যারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। এ অবস্থায় কেউ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাও মনে করা চলে না। তবু আলতামণির আর্ত্তনাদে কেহ সাড়া দিল না।

ভৈরবের হাঁকের জবাবে মহিম বলিল, 'চালায় বটে নাকি? কতক্ষণ?'

ভৈরব বলিল, "এই মাত্তর উঠলাম, ভাবছিলাম চৌকীর পরে

রাতটুকুন কাটাব, তা শালার জল হু হু করে বাড়তে সুরু করে দিলে। দিনে দিনে ভাগ্যি সব ক'টাকে রেখে এলাম বনগাঁয়ে, নয় তো বিপদ ঘটত। চাল ক'টা নিতে এসে নিজে হলাম আটক। কানাই না'টা নিয়ে গেল বিকেলে, বলল কি, এই এলাম বলে মামা, হাটতলা যাব আর আসব। মিথ্যুক লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটার আর পাত্তা নেই।'

আবার আলতামণির আর্ত্তনাদ শোনা গেল, 'মহিমমামা! ভৈরব-মামা!—আগো শুনছ?'

ভৈরব মহিমকে বলিল, 'ঘরে ঘরে সমান বিপদ, আলতামণির চিল্লানিটা শুন্‌ছ? সবার আগে মাচান হল তোর, আগে থেকে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসে আছিস মাচানে উঠে, এত চেঁচানি কিসের রে বাবু!'

'অমনি স্বভাব ছুড়ির, গাঁ শুদ্ধু লোক দেখতে পারে না সাধে?'

মহিম বোধ হয় তামাক সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, আগুন দেখা গেল। একটু তামাক টানিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু মহিমের মাচানে যাওয়ার উপায় নাই। গেলেও সুবিধা হইবে না, অতটুকু মাচানের উপর মহিমের বৌ, মহিমের ছেলের বৌ, দু'টি বয়স্কা মেয়ে, সকলে আশ্রয় নিয়াছে। তাদেরি বোধ হয় নড়িবার ঠাঁই নাই, ওর মধ্যে কোথায় বসিয়া সে তামাক টানিবে? ডিঙ্গি নৌকাটি অবশ্য আছে মহিমের, কিন্তু তাকে তামাক খাওয়ানোর জন্য মহিম যে মাচান হইতে নামিয়া ডিঙ্গিতে করিয়া এখন তার চালায় আসিয়া উঠিবে সে ভরসা নাই। কোমরে দু'টি বিড়ি আর দেশলাই গোঁজা ছিল, একটু হিসাব করিয়া ভৈরব একটা বিড়ি ধরাইল।

তারপর আবার শোনা গেল আলতামণির আর্ত্ত চীৎকার,—এবার আওয়াজটা আরও তীক্ষ্ণ, আরও মর্ম্মভেদী।

'ও মহিমমামা! ও ভৈরবমামা! তোমাদের ভাগ্নি-জামাই যে মরে গেল গো, একবারটি আসবে না?'

মহিম হুঁকায় একটা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যাবে নাকি?'

ভৈরব বলিল, 'চল যাই। হুঁকাটা এনো দাদা, বিড়িফিড়ি একদম মুখে রুচে না।'

বাড়ীর পিছনে সব চেয়ে মোটা আমগাছটার অনেক উঁচুতে মোটা ডাল বাছিয়া আলতামণির মাচান বাঁধা হইয়াছে। গাছটার সকলের নীচের ডালটা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে, দেড়খানা মানুষ ডুবিয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের কিছু নাই, উঁচু জমিতে উঁচু ভিটায় ভৈরবের বড় ঘর, চালা হইতে নামিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছে সে ঘরের দরজার অর্দ্ধেকের বেশী জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছে। ইঁট দিয়া তক্তপোষ উঁচু করিয়া কি সাহসেই সে ঘরের মধ্যে রাতটা কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল! তক্তপোষটা এখন বোধ হয় ঘরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে আলতামণির অবস্থা সত্যই কাহিল। কাছে আসিয়া ভৈরব ও মহিম দু'জনেই বুঝতে পারিল, অকারণে আলতামণি ওরকম আর্ত্তনাদ করে নাই। আমগাছের ডুবুডুবু ডালটা সে এক হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, অন্য হাতে ধরিয়া আছে কানাইকে। কানাই জীবিত না মৃত বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু একেবারেই নিশ্চেষ্ট, আলতামণি ছাড়িয়া দিলেই জলে ডুবিযা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এমনিভাবে গা এলাইয়া দিয়াছে।

'ধর মামা, চট করে ধর একজন,—হাত এলিয়ে গেছে আমার। কত্খন এমনি করে ধরে আছি।'

মৃদু ও মধুর গলা আলতামণির, কে বলিবে একটু আগে তারই গলা দিয়া অমন ইঞ্জিনের হুইসেলের মত আওয়াজ বাহির হইয়াছিল !

গাছের ডালে ডিঙ্গি বাঁধিয়া দু'জনে ধরাধরি করিয়া কানাইকে ডিঙ্গিতে তুলিতেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝা গেল। কানাইয়ের মুখ দিয়া দেশী মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে।

ভৈরব বলিল, 'বটে ! এইজন্য বাঁদরটার না'য়ের দরকার হয়েছিল ! না'টা হল কি রে আলতা, এঁ্যা ?'

আলতা তখন ডালটার উপর বুক দিয়া হাঁপাইতেছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। ক্ষীণস্বরে বলিল, 'ভেসে গেছে।' ভৈরব চমকাইয়া বলিল, 'ভেসে গেছে ! কোন্‌দিকে গেল ? হায় সব্বোনাশ !'

আলতা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'কোনদিকে গেল কি করে বলব মামা ? আমার ইদিকে এমন সব্বোনাশ—'

'সব্বোনাশ ? তোর সব্বোনাশ ? আমার না' গেল, সব্বোনাশ তোর ? বজ্জাতটাকে ধরলি কেন তুই, বানের জলে গাঁয়ের কলঙ্ক ধুয়ে যেত ! ও ছোঁড়া যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন তোর সব্বোনাশ, বেটাচ্ছেলে মরলে তোর হাড় জুড়োবে।'

'শাপমণ্যি দিওনা মামা—গুরুজন বটে ন' তুমি ?'

আলতা হাঁপাইতে ভুলিয়া গিয়াছে, ভৈরবের নৌকা জলে ভাসিয়া যাওয়ার অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছে, নীচু গলাতেও কোমলতা নাই,—গাছের ডালে ভর দিয়া এমন ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছে যেন সাপের মত ছোবল দিবে।

মহিম ভৈরবকে সাহস দিয়া বলিল, 'কোথাও ঠেকে থাকবে নিশ্চয়, —কাল পাত্তা মিলবে।'

নৌকার শোকে কাতর ভৈরব জবাব দিল না। জলে ঢেউ নাই, কিন্তু স্রোত প্রবল। তিনজনের ভারে ডিঙ্গি নৌকাটির এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ঢেউ থাকিলে হয়ত ডুবিয়াই যাইত। আলতামণি হাত বাড়াইয়া ডিঙ্গির প্রান্তটা ধরিতেই ভৈরব জোর করিয়া তার হাত ছাড়াইয়া দিল।

'ডুবিয়ে মারবি নাকি সবাইকে?'

আলতামণি আবার কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'অমনি করে ফেলে রাখবে নাকি? মাচানে তোল তবে ধরাধরি করে?'

ডিঙ্গির মাঝখানে একটা নির্জ্জীব বস্তার মত কানাইকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানেও জলের অভাব নাই। শরীরের হাড়গোড় থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া গা এলাইয়া পড়িয়া থাকা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব কানাইকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না। তবে কানাইয়ের পড়িয়া থাকিবার ভঙ্গির জন্য নয়, অতটুকু ডিঙ্গিতে এতগুলি লোকের থাকা নিরাপদ নয় বলিয়াই ভৈরব আর মহিম পরামর্শ করিয়া কানাইকে মাচানে তুলিবার কষ্টটা স্বীকার করাই স্থির করিয়া ফেলিল। এ বন্যা, আর কিছু নয়। নদীর বাঁধ কতটুকু ভাঙ্গিয়াছে কে জানে, কতখানি ভাঙ্গিবে তাই বা কে জানে। এমন বন্যা আর কখনও হয় নাই, এর চেয়ে ভয়ানক, এর চেয়ে সর্ব্বনাশকারী বন্যা কল্পনা করা অসম্ভব, তবু এখনও কিছু বলা যায় না। এ বন্যা, আর কিছু নয়। হয়ত হঠাৎ প্রবল গর্জ্জন করিতে করিতে কোথাকার আটকানো জলরাশি ছুটিয়া আসিবে। তাদের চিহ্নও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া, আলতামণি কানাইকে এভাবে ডিঙ্গিতে পড়িতে থাকিতেও দিবে না, সে নিজে ডিঙ্গিতে উঠিয়া আসিবেই। একজনের ডিঙ্গিতে চারজন উঠিলে চলিবে কেন?

মাচানে উঠিবার বাঁশের মইটা কানাই মন্দ করে নাই, গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে শক্ত করিয়া। এদিক দিয়া বজ্জাতটার গুণ আছে অনেক,—যা' করে ভাল করিয়াই করে। কত তাড়াতাড়ি মাচান বাঁধিয়াছে, হাতের কাছে যা' কিছু উপাদান পাইয়াছে তাই লাগাইয়াছে কাজে, তবু মাচানটি যেন দারুণ বিপদে ক'দিনের জন্য নিরুপায়ের আশ্রয় নয়, বন্যা উপভোগ করিবার আরামের ব্যবস্থা। উপরে ছাউনিটা পর্য্যন্ত এমনভাবে করিয়াছে যেন বহুকাল রোদ বৃষ্টি ঠেকাইবার জন্য ছাউনিটার দরকার হইবে।

ক্ষীণ চাঁদের আবছা আলোয় বাঁশের মই বাহিয়া শবের মত একটা নিশ্চেষ্ট শিথিল দেহ মাচানে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দূর সম্পর্কের দুই মামার অকথ্য গালাগালিতে আলতামণির শ্রবণ-যন্ত্র দু'টি যে একেবারে বিকল হইয়া গেল না, সে এক রহস্যময় ধর্ম্ম বটে মানুষের ইন্দ্রিয়ের। আলতামণির আর্ত্তনাদে সাধে কেউ সাড়া দেয় না! তার প্রত্যেকটি আর্ত্তনাদ শেষ পর্য্যন্ত এমনিভাবে মানুষকে হাঙ্গামায় ফেলে, প্রাণান্ত করিয়া ছাড়ে। বৈশাখের প্রথমে মাঝরাত্রে সে একবার এইরকম আর্ত্তনাদ করিয়াছিল,—ঘরে তার আগুন লাগিয়াছে! কেন লাগিয়াছে? নদীর মোটে তিন মাইল দূরে এই গ্রামে বৈশাখ মাসে জলের জন্য মানুষের যেমন পিপাসা জাগে তীব্র, নারীবহুল এই দেশে আলতামণির জন্য কয়েকটা মানুষের তেমনি কামনা জাগিয়াছিল বলিয়া। আলতামণিকে না পাইলে আলতামণির ঘরে আগুন দিতে হয়, এমন হিংস্র সেই কামনা।

মাচার একপাশে কানাইকে ফেলিয়া দিয়া মহিম ও ভৈরব ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। আলতামণি কানাইকে উপরে তুলিতে তাদের সাহায্য করিতে পারে নাই, সেটা সম্ভব ছিল না। এখন তাড়াতাড়ি

কানাইয়ের ভিজা কাপড় বদলাইয়া নিজের একটা শাড়ী দিয়া সে তাকে ঢাকিয়া দিল। গাছের পাতা আর মাচানের ছাউনি এখানে জ্যোস্নাকে আড়াল করিয়াছে,—মাচান অন্ধকার।

'কি হইছে মামা? নড়ন চড়ন নাই যে?'

ভৈরব বলিল,—'কি হইছে সে তো তুই জানিস—আমরা কি করে বলব?'

মহিম বলিল—'হবে আবার কি, ঠেসে মদ গিলেছে, এখন জ্ঞান নেই।'

আলতামণি কাঁদ কাঁদ গলায় বলিল, 'ফিরে এসে কি সব আবোল-তাবোল বকতে বকতে মই বেয়ে উঠছিল মামা, হঠাৎ কি হ'ল পড়ে গেল নীচে। ভেসেই যেত চলে, মাচান থেকে ঝাপ দিয়ে ধরেছি। তখন চেতনা ছিল না মামা—অমন হঠাৎ চেতন লোপ পেল কেন মামা? বড় ডর লাগে মামা, গা কাঁপছে মোর—হা ছাখো—'

গা কাঁপিতেছে কিনা না দেখিয়াই তাকে ঠেলিয়া দিযা ভৈরব বলিল, 'দেখেছি বাবু, দেখেছি। বক বক না করে মাথায় হাওয়া কর, আপন থেকে চেতন আসবে। বেশী গিললে অমন হয়।'

হাওয়া করার কথাটা খেয়াল ছিল না, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলতামণি পাখা খুঁজিয়া বাহির করিল, তারপর কানাইএর মাথায় জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, 'আস্তে আস্তে হাওয়া কর, অত জোরে লোকে হাওয়া করে না কি?'

'না মামা, জোরে জোরে করি, শীগ্‌গির চেতন হবে।'

'যেমন মুখ্যু তুই,—আস্তে হাওয়া দিলে বেশী কাজ দেয়। তিনবার আমায় মারলি পাখা দিয়ে, পাখা রাখ, আঁচল দিয়ে হাওয়া দে।'

আলতামণি এ পরামর্শ শুনিল না, পাখা দিয়াই হাওয়া করিতে লাগিল। তবে অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে নয়, ধীরে ধীরে।

খানিক পরে মহিম বলিল, 'এবার যাই আমরা ?'

'না মামা না, ভোরবেলা তক্ বোসো, পায়ে ধরি তোমাদের।'

ভৈরব অন্ধকারে হাসিয়া বলিল, 'এত ভয়কাতুরে যদি তুই, কানাই তো ক'দ্দিন রাতে ঘরে থাকে না, একা থাকিস কি করে শুনি ?'

'আজ যে চেতন নেই মামা।'

পাখাটা কানাই-এর মাথায় ঠেকিয়া যাওয়ায় মাচানের উপর পাখাটা একবার ঠুকিয়া আলতামণি আবার বাতাস করিতে লাগিল।

তারপর অস্ত যাওয়ার আগেই চাঁদ ঢাকিয়া গেল মেঘে, ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার পর আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া দু'একটা তারা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে ভোরের আলোয় ধীরে ধীরে ম্লান হইযা মিলাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিযা দেখিতে আর কোন বাধা রহিল না। তবে দেখিবার কিছু নাই। এ বন্যা, আর কিছু নয়। বন্যা দর্শনীয় নয়, বর্ণনীয় নয়। বুক চাপড়াইবার, মাথা কপাল ঠুকিবার যা' কারণ, উপবাসে আর রোগে মরণ ঘটিবার যা' কারণ, আগামী বন্যায় বুক চাপড়াইয়া মাথা কপাল ঠুকিয়া উপবাস করিয়া আর রোগে ভুগিয়া মরা পর্য্যন্ত রাক্ষুসে জোঁকের কাছে ঋণী থাকিবার যা' কারণ, তার মধ্যে পর্য্যন্ত দেখিবার মত কিছু নাই, বর্ণনা করিবার মত কিছু নাই। চারিদিক জলে ডুবিয়া আছে, বন্যার এই চরম দেখা। চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বন্যার এই চরম বর্ণনা।

ভৈরব শেষ বিড়িটা ধরাইবে কি না ভাবিতেছিল। .বিড়িটা জমাইয়া রাখিবার আর বোধ হয় দরকার নাই। মহিমের ডিঙ্গিতে তার হারান

নৌকার খোঁজে বাহির হইলে এখানে ওখানে তামাক কি দু'এক কল্কি জুটিবে না? আলতামণি এখনও কানাইকে সমানে বাতাস করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ পাখা বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা গলায় সে বলিয়া উঠিল, 'একবারটি ছাকো দিকি মামা ভাল করে তাকিয়ে?'

মহিম ও ভৈরব তাকাইয়া দেখিল। দু'জনের মুখ পাংশু হইয়া গেল। 'এমন ধারা মুখ হল কেন মামা? শ্বাস পড়ছে না কেন মামা?' কানাই-এর মুখ দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। কতক্ষণ তার শ্বাস পড়িতেছে না, তাও অনেকটা অনুমান করা যায়।

ভৈরব ও মহিম পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কাল অত হাঙ্গামা করিয়া মই বাহিয়া তারা কি তবে একটা শবকে মাচানে তুলিয়াছে? ভৈরব গুরুজন হইয়া কি শাপমণ্যি করিয়াছে একটা মৃত মানুষকে?

তাই সম্ভব। মাচান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কানাইকে আলতামণি বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই, এক হাতে আমগাছের ডালটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে কানাইকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আর তীব্র মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়াছিল। তবু বন্যার স্রোত তখন কানাইকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এ বন্যা, আর কিছু নয়। বন্যা মানুষকে রেহাই দেয় না। সাবিত্রী আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে পর্য্যন্ত বন্যা সাবিত্রীর স্বামীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সাবিত্রী বিধবা হইয়া যায়।

মমতাদি

শীতের সকাল। রোদে ব'সে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে ব'সে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনারা রান্নার জন্য লোক রাখবেন? আমি ছোট ছেলে-মেয়েও রাখব।

নিঃসঙ্কোচ আবেদন। বোঝা গেল সঙ্কোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় করে ফেলেছে। তাই যেটুকু সঙ্কোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরণে সেলাই করা ময়লা সাড়ী, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমান্ত পর্য্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষত-চিহ্ন—আন্দাজে পরা টিপের মত।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনী?

চমকে তার মুখ লাল হল। সে চমক ও লালিমার বার্ত্তা বোধ হয় মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আমি রাঁধুনী। আমায় রাখবেন? আমি রান্না ছাড়া ছোট ছোট কাজও করব।'

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম, সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশী কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ী থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ীর একতলায় সে থাকে। তার স্বামী

আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরী নেই চারমাস, সংসার আর চলেনা, সে তাই পর্দ্দা ঠেলে উপার্জ্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরী। মাইনে? সে তা জানেনা। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবেনা।

পনের টাকা মাইনে ঠিক হল। সে বোধ হয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চ'লে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন? রান্নাঘর দেখবেনা? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখবো, ব'লে সে এক সেকেণ্ড দাঁড়ালনা, আমায় তুচ্ছ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল। ওকে আমার ভাল লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু! আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে মার কাছে গেলাম। একটু বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টি গলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ়!

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে? ভাবিসনা, তোকে খুব ভাল বাসবে। বার বার তোর দিকে এমন ক'রে তাকাচ্ছিল!

শুনে খুশী হলাম। রাঁধুনীপদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ ক'রে গেল। যে বিষয়ে উপদেশ পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি

খাটিয়ে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করল—অনর্থক প্রশ্ন করল না, নির্দ্দেশের অভাবে কোন কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এবাড়ীতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিঁখুত হল তার কাজ। জল তোলা, মসলা বাটা, চাকরের কর্ত্তব্য ; চাকরকে বারান্দায় ব'সে আরামে বিড়ি টানতে দেখেও সে অনুরোধ জানাল না, নিজেই জল তুলে মশলা বাটতে বসল। মার ধমক খেয়ে চাকর কাছে যাওয়ামাত্র শিল ছেড়ে উঠে গেল।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলে তো খুসী হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল ক'রে সে যে আমায় খুব ভালবাসবে তার কোন লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুন্ন। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার পাঁচ বার রান্না ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালবাসল না। বরং রীতিমত উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয় সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার ক'রে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দু'একটি দরকারী কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাসির শব্দ পর্য্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতই ম্লানিমার ঐশ্বর্য্যে মহীয়সী, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার অতীত, শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্ব্বিকার।

রাগ ক'রে আমি স্কুলে চ'লে গেলাম। সে কি ক'রে জানবে মাইনে-করা রাঁধুনীর দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ীর ছোট কর্ত্তা ছটফট করছে!

সপ্তাহখানেক নিজের নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়ীতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল একগাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাণ্ড ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন

ভাগটা মুখে পূরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ্ ক'রে হাত ধ'রে ফেলল। রাগ ক'রে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুণছিলাম। যা খেয়েছ তাতেই বোধ হয় অসুখ হবে, আর খেয়োনা। কেমন?

ভৎ‍র্সনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাব্‌লা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম; এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসো জল খাবে।

বাড়ীর সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্না ঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি—

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কি হল বামুনদি?

সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হঠাৎ আমার গা ঘেষে ব'সে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলোনা খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোট এক নিশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথমটা ভারি লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব্ব কথোপকথন মনে

ক’রে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে এরকম জড়িয়েই ধ’রে ছিল, হাত সরিয়ে ধরা-পড়া চোরের মত হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল, দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন ক’রে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে!

তখন বুঝিনি আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব্ব প্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,—যদি কেবল মুখ কালো ক’রে সরে যেতেন, পরদিন থেকে সে আর আসত না। পনের টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললেন, ও, ওইরকম। সারাদিন বক বক করে। বেশী আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।

ব’লে মা চ’লে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্ব্বোধ্য রহস্য টপ টপ ক’রে ঝ’রে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়ত শুকনোই থাকত, সম্মানে চোখের জল ফেলল! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধ হয় তার সইল না।

তিন চার দিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হল, আঙ্গুলের দাগ। মাষ্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙ্গুলের দাগ কেন? কে চড় মেরেছে?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়ে বলল, দূর! তারপর হেসে বলল,

আমি নিজে মেরেছি। কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে—

মশা মারতে গালে চড়! ব'লে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ ক'রে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমারও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদ্‌বুদ্‌ফাটা বাষ্পে কি দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নীচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ দিদি। তোমায় কেউ মেরেছে।

সে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলছি, না। কে মারবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ ক'রে থাকতে হল। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠার আনা আছে! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথার সুর সমস্ত আমার কাছে ওকথা ঘোষণা ক'রে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপি চুপি বলল, কারো কাছে যা পাইনা, তুমি তা দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি দিলাম আমি?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হঠাৎ সে তরকারী নামাতে ভারি ব্যস্ত

হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়ে একরাশি চুল মেঝে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কি একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

রহস্য বৈকি। গালে চড়ের দাগ, চিরদিন যে ধৈর্য্যময়ী ও শান্ত তার ব্যাকুল কাতরতা, ফিসফিস ক'রে ছোট ছেলেকে শোনানো; কারও কাছে যা পাইনা তুমি তা দেবে কেন? বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড় রহস্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেয়নি! ভেবে চিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণী পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রে দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হল, সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরী হলে তুমি কি করবে?

তুমি কি করতে বল? হরিরলুট দেব? না, তোমায় সন্দেশ খাওয়াব?

ধেৎ, তা বলছি না। তোমার বরের চাকরী নেই ব'লে আমাদের বাড়ী কাজ করছ তো, চাকরী হলে করবেনা?

সে হাসল, করব। এখন করছি যে!

তোমার বরের চাকরী হয়েছে?

হয়েছে, ব'লে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা, স্বামীর চাকরী নেই ব'লে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েচে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মার এই মন্তব্য শুনে মমতাদির বরের চাকরীর জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার চাকরী হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরী হয়েছে?

সে স্বীকার ক'রে বলল, হয়েছে। বেশী দিন নয়, ইংরাজী মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক ক'রে দিতে পারছ না ব'লে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্ততঃ করছ? তার কোন দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েছে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এবেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পার, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল, সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরী হয়েছে তবু?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরী, তাতে কুলবেনা মা। আমায় ছাড়াবেন না। আমার কাজ কি ভাল হচ্ছে না?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবেনা মা। সেজন্য নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেছে, তুমি চ'লে গেলে আমাদেরও কি ভাল লাগবে?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কি হয় খোকা?

মিথ্যে বললে কি হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুরুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যা বললে?

এটা জানতাম না। গুরুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশী পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি। কাঁদছ কেন?

তখনও তার চাকরীর একমাস বোধ হয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাছে কমলা লেবু কিনছে।

সঙ্গে নেবার ইচ্ছা নেই টের পেয়েও এক রকম জোর করেই বাড়ী দেখতে গেলাম। দু'টি লেবু কিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা করে এই যমালয়ের পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল! গলিটা আস্ত ইঁট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। দুদিকের বাড়ীর চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জ্জনা জমা করা আর একটা দূষিত চাপা গন্ধ। আমি সঙ্কুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না?

ও কথা মনে হলেও ভদ্রতার খাতিরে অস্বীকার করলাম। সে হেসে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ পথের ধারে ঘেঁষে দাঁড়াল।

গলি দিয়ে দুএকটি লোক চলছিল, মমতাদির সর্ব্বাঙ্গে চোখ বোলানোতেই অভদ্রতার সীমা রেখে। একটি মাঝ বয়সী খুব ফর্সা লোক কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করে গেল। মমতাদির গা ঘেঁষে যাবার সময় চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

লোকটির চেহারা ও পোষাক দুয়েরই দিব্যি জলুষ। এই গলি দিয়ে তার হেঁটে চলা যেন গলিটাকে পরিহাস করা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখ দেখে মনের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করতে করতে মমতাদি বলল, 'আমার আত্মীয় হয়—ঠাট্টার সম্পর্ক।'

সাতাশ নম্বরের বাড়ীটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যতক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোট একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের

প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নীচে ঘরের সংখ্যা বোধ হয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যেভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোট ছোট কুঠরির বেশী কিছু আবিষ্কার করতে পারলামনা। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু রোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রণের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লার ধোঁয়ায় কয়লার বর্ণ পেয়েছে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘরে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই শোবার ঘর ক'রে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশী মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনি অবস্থান যে, আলো যদিও কিছু কিছু আসে, বাতাসের আসাযাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায় না। সংসারের সমস্ত জিনিষই প্রায় এঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কমদামী শ্রীহীন জিনিষ। এই শ্রীহীনতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড় চৌকী, তাতে গুটানো মলিন বিছানা। চৌকীর তলে একটা চরকা আর ভাঙ্গা বেতের বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তরালে হয়ত আরও জিনিষ আছে। ঘরের এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাঙ্ক—দুটিরই রঙ চ'টে গেছে, একটির তালা ভাঙ্গা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনের ঠিক উর্দ্ধে কোণাকুণি টাঙ্গানো দড়িতে খানকয়েক কাপড়। এই দুই কোণের মাঝামাঝি দেওয়াল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙ্গা টেবিল, আগাগোড়া দড়ির ব্যাণ্ডেজের জোরে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই খাতা, একটি অল্পদামী টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আর্সি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিষ। টেবিলের উর্দ্ধে দেওয়ালের গর্তের তাকে কতকগুলি বই!

ঘরে আর একটি জিনিষ ছিল—একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। চৌকীতে শুধু মাদুরের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত দিল, তারপর গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিস টেনে বার করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথার তলে বালিশ দিয়ে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। উনি ত রাগ ক'রে—কই, তুমি লেবু খেলেনা ?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ করে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেবনা, একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আনলাম !

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মত ভালবাসত !

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও করে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, জল তুলল, তারপর মসলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ী যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েছে।

কয়েক মিনিট পরে রাজা যেন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন এমনি ভঙ্গিতে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের একটি লোক বাড়ী ঢুকল। গৃহ প্রবেশের রকম দেখেই আমি তাকে চিনলাম। মমতাদির স্বামী নগেন।

যেমন রোগা তেমনি ঢেঙ্গা। এত লম্বা লোক কোন দিন আমার চোখে

পড়েনি। লম্বাও আবার এক অদ্ভুত রকমের। দেহের দীর্ঘ কাঠামোর সঙ্গে খাপ খেতে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন লম্বাটে হয়ে গেছে। বাহু দুটি অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ, দুদিক চাপা ফজলি আমের মত লম্বাটে মুখে খাঁড়ার মত নাক, চিবুকটা ঠেলে নেমে ডগাব দিকে চোথা, হয়ে গেছে মাথার চুলও মেয়েলি ধরণে বড় বড়—ঠিক বাবরি নয়। গায়ের কোটটা পর্য্যন্ত বালিশের ওয়াড়ের মত সরু আব দীর্ঘ। দোর থেকে তিনবাব পা ফেলেই রোয়াকে পৌছল। নীচু হযে আমাব মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ ক'রে বলল, তুমি কে হে?

মুখে তামাকেব দুর্গন্ধ, দাঁতগুলি কালো। আমি মুখ সরিযে নিযে বললাম, আমি সুরেশ।

সুবেশ নাকি? বেশ দাদা বেশ। তা আমাব বাড়ীতে হঠাৎ সুবেশের আমদানি কি জন্য? এ বাড়ীতে সুরের রেশটুকুও যে নেই দাদা? ওর জন্য নাকি?

মমতাদি বলল, এসব কি বলছ ছেলেমানুষকে? আমি ওদেব বাড়ী কাজ করি, ওকে আমি ডেকে এনেছি। ওকে ভয দেখাচ্ছ কেন?

নগেন চট ক'রে সোজা হযে গেল, ভয দেখাচ্ছি? বড় যে লম্বা চওড়া কথা শিখেছ! আমি ভূত নাকি যে ভয দেখাব?

মমতাদি কথা না ক'যে মসলা বাটতে লাগল। নগেন লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা বিড়ি বাব ক'বে ধবাল। আচমকা নীচু হযে আমার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে হ্যা হ্যা ক'রে হাঁপানির মত হাসল। বিড়ির কড়া ধোঁযায় আমি কেশে ফেল্‌লাম।

ছি! ওকি কর? ব'লে মমতাদি শিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নগেন ফের ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে গেল, তুমি ফোঁড়ন

কাটছ কেন ? ঠোঁট দুটো বন্ধ ক'রে রাখতে পার না ? ব'লে ঠোঁটে এত জোরে টোকা দিল যে ব্যথায় সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

বেড়ে দেখাচ্ছে তোমায় মাইরি—খাসা। বোধ হয় গালে টোকা দিলে আরও বেড়ে দেখাবে। দেব ?

মমতাদি পিছু হটল। বলল, খোকার টনিক বুঝি নিজেই গিলে এসেচ ?

আলবৎ। খোকা টনিক দিয়ে করবে কি ? এখনও খোকার টনিক খাওয়ার বয়স হয় নি। টনিক লাগে এই আমাদের—ব'লে সগর্ব্বে নিজের বুক ঠুকে দিল। তারপর হঠাৎ মুখের জ্বলন্ত বিড়িটা আমার জামার পকেটে পুরে দিয়ে দুই কোমরে হাত রেখে সামনে পিছনে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

মমতাদি বলল, তুমি ওর সঙ্গে অমন করছ, এর ফল কি হবে জান ?

জানি। হাত দিয়ে আমার মাথাটা কচাৎ ক'রে কেটে নেবে !

মমতাদি বলল, তোমার মাথার কিছু হবে না, চাকরী যাবে আমার। তুমি কি মনে কর ও বাড়ী ফিরে তোমার ব্যবহারের কথা ব'লে দিলে আর একদিনের জন্যও ওর মা আমাকে রাখবেন ? যা খুসী তোমার কর। কিন্তু কাজ গেলে আমায় দুষোনা।

একথা মন্ত্রের মত কাজ করল। নগেন মুহূর্ত্তে দমে গিয়ে বলল, ইস ! সেটাতো খেয়াল করিনি ! আগে বলতে হয়।

তারপর মুখখানা করুণ করে বলল, তা খোকাবাবু বাড়ীতে বলতে যাবে কেন ? আমি ঠাট্টা করছিলাম বৈত নয় ! ঠাট্টা শুনে রাগ করবে, বাড়ীতে নালিশ করবে, খোকাবাবুকে তুমি এত বোকা ভাব নাকি ?

কি জানি। কাল চাকরী থাকবে কি যাবে দেখেই সেটা বোঝা যাবে। খোকার রাগ তুমি জান না। ব'লে মমতাদি ঘরে চলে গেল।

নগেন ধপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। গলা নীচু করে বলল, চুপি চুপি না হয় তোমার পা ধরছি ভাই, রাগ রেখোনা। আমি না বুঝে বড্ড দোষ করেছি। অনুতাপে এখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

তার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগল! আমার অবশ্য আর রাগ রইল না, কিন্তু কি বলব ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম। নীরবতাকে রাগ মনে করে সে হঠাৎ নিজের কান মলে কাতর স্বরে বলল, বাড়ীতে বোলোনা ভাই, মরে যাব। তোমার দিদি পর্য্যন্ত যে উপোস করবে রে দাদা।

আমি তাড়াতাড়ি জানালাম যে রাগ করিনি, বাড়ীতেও বলব না। শোনামাত্র তার সব কাতরতা দূর হয়ে গেল। অনুযোগ দিয়ে বলল, তুমি বড় নিষ্ঠুর ভাই! পায়ে ধরালে কান মলালে তবে ক্ষমা করলে। তুমিই বল, শুধু ক্ষমাতে কি এখন আমার মন ওঠে? ক্ষমার সঙ্গে একটু দয়াও ক'রে ফ্যালো, আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাক। বেশী নয় ভাই, একটু দয়া। যৎসামান্য।

কি বলুন?

বলছি। কিন্তু মনে রেখো আমার জন্য চাইছি না দয়া। তেমন পাত্র আমি নই। নিজের দুঃখের কথা আমি কাউকে বলি না। কার জন্য দয়া চাই জান? তোমার ওই দিদির জন্য। ওর বড় লজ্জা, তাই মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমার কাছে কাঁদে আর বলে, পনের টাকায় কুলোয় না, কি করি আমি, একদিন বিষ খেয়ে মরে যাব। মাইরি, ও

কথা বলে আর হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। সে কান্না দেখলে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কালীর দিব্যি।

নগেন বলল, দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে না দিলে ত ওকে বাঁচানো চলে না ভাই। ভয়ে মরি, দুঃখের জ্বালায় কবে সত্যি সত্যি বিষ খেয়ে ফ্যালে। তুমি যদি মাকে বলে ওর দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে পার তবেই সর্ব্বরক্ষে হয়। নইলে রোজ ওর বুকফাটা কান্না আর সয় না। নগেন মাথা নাড়তে লাগল।

আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলাম মাকে বলব। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে নগেন আচমকা আমায় সশব্দে চুম্বন ক'রে ফেলল। আমি আঁৎকে উঠে ছিটকে স'রে গেলাম। নগেন হাত জোড় ক'রে বলল, চটোনা দাদা। তোমায় বড় ভালবাসি কিনা, তাই সামলাতে পারলাম না।

বুক্তকর মুক্ত ক'রে সে ফের মুখখানা করুণ করল, কি ভাবছি জান দাদা? ভাবছি দুটাকায় কি তোমার দিদির কান্না ঘুচবে! অভাবের সমুদ্রে দুটাকা দু'ফোটা শিশির বইত নয়। তুমি বরং পাঁচটা টাকার কথাই বোলো। কেমন? তোমরা হলে রাজামানুষ, পাঁচটা টাকা তোমাদের কাছে পাঁচটা পয়সা। এ্যাঁ?

আমি স্বীকার করলাম। নগেন বলল, ওকে বলোনা কিন্তু। ওর বড় লজ্জা কিনা, কেঁদে কেঁটে অসুখ ক'রে ফেলবে। হয় ত লজ্জা বিষও খেয়ে ফেলবে। জান, ওর কাছে আধ ভরি আফিং আছে।

তারপর একসময় মমতাদি বলল, চল খোকা, আমরা যাই।

নগেন সুধাল, তুমি কোথা যাবে শুনি?

দুবেলা যেখানে রাঁধতে যাই সেখানে, আবার কোথা?

কী! উনুন ধরাবে কে, ভাত চাপাবে কে?

তুমি। আমার আজ সময় নেই।

তোর সময়ের নিকুচি করেছে! রোজ ভাত নামিয়ে নিই তাই তোর বাবার ভাগ্যি তা জিনিস? উনুন ধরা ভাত চাপা, তারপর যেখানে খুসী মরবি যা। মমতাদি উঠানে নেমে পড়েছিল, রোয়াকে উঠল। বলল, বেশ, সব করে দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু কাল চাকরী গেলে আমায় মারতে উঠোনা যেন!

জোঁক ফণা ধরেছিল, মুখে নুন পড়া মাত্র নরম হয়ে গেল।

চাকরী যাবে কেন?

কেন? বেশ! সময় মত কাজে না গেলে কে পয়সা দিয়ে লোক রাখে? নটা বাজতে না বাজতে নাকে মুখে ভাত গুঁজে আপিসে ছোট কি জন্য? তোমার চাকরী, আমার চাকরী নয়?

নগেন একদম কাদা হয়ে গিয়ে বলল, তোমার কাজে যাওয়ার সময় নাকি? তবে তুমি যাও। দেরী কোরোনা, চলে যাও। এদিকে যা হবার হবে।

মমতাদি হাসল, এদিকে সব হবে, তুমি ভেবোনা। খোকার অসুখ, আমি শীগগির ফিরে আসব।

মাস চারেক পরে আমিও বুঝলাম তার ছেলে হবে। আরও মাসখানেক সে কাজ করল, তারপর বাধ্য হয়ে আসা বন্ধ করল। দশবার দিন পরে খবর নিতে গেলাম। দেখলাম রোয়াকের যে প্রান্তটা খালি ছিল সেখানে চাঁচের বেড়ার আঁতুড় ঘর নির্ম্মিত হয়েছে। ছাদটাও চাঁচের, তবে তার ওপরে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছান। ছেঁড়া মলিন বিছানায়

সে শুয়ে ছিল, পাশে একটা কাঁথা জড়ানো পুঁটলি। পুঁটলিটা চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কল্পিত স্তন চুষছে।

লুব্ধ হয়ে বললাম, কোলে নেব দিদি ?

কাশিতে তার গলা ভেঙ্গে গিয়েছিল, বিশ্রী শব্দ ক'রে বলল, আজ নয় ভাই। ওটা আজ অস্পৃশ্য, ছুঁলে নাইতে হবে। আঁতুড় উঠুক তখন কোলে নিও। সোমবারের পরে একদিন এসো, কেমন ?

বৃহস্পতিবার গেলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কোলে নিতে ঘেন্না হল। আঁতুড় ঘরটা অদৃশ্য হয়েছিল, রোয়াকে কাঁথায় শিশু শুয়ে ছিল। রোগা কালো, পেটটা টিম্‌টিমে, গলায় লাল লাল ঘা। প্রথম দিন শুধু ফুলের মত মুখখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজ সম্পূর্ণ অবয়ব দেখে দারুণ বিতৃষ্ণা হল।

সে বলল, নেবে কোলে ?

আমি বিপদে প'ড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বললাম, দাও। ওর গলায় কি হয়েছে দিদি ?

শিশুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে বলল, কুষ্ঠ।

আমি চমকে বললাম, কুষ্ঠ ?

সে চোখ তুলে তাকাল। দুচোখে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি।

না ভাই, কুষ্ঠ নয়। গরম তেলে পুড়ে গেছে। কিন্তু ওকে তোমার কোলে নিয়ে কাজ নেই। ওর শরীরে অনেক ফোস্কা, লাগবে।

কে গরম তেল ফেলে দিয়েছে দিদি ?

সে নীরবে চোখ মুছল, জবাব দিল না। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। মমতাদি রোগা হয়ে গেছে, চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, চোখ দিয়ে যেন দুঃখের কালি গাড়িয়ে প'ড়ে শুকিয়েছে।

আরও তিন মাস কাটল। সে মা হবার ধাক্কা সামলে প্রায় আগের মত সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, কিন্তু কাজ করতে এল না। একদিন স্কুল যাবার পথে মমতাদির ওখানে গেলাম।

নগেন আপিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রোয়াকে টুলে ব'সে পান চিবোচ্ছিল, আর গর্জ্জন ক'রে কি সব বলছিল। ছোট ছেলেকে স্নান করিয়ে কাজল পরাতে পরাতে মমতাদি নির্ব্বিকার চিত্তে শুনে যাচ্ছিল।

উঠানে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল মমতাদির বড় ছেলে পাঁচু।

আমায় দেখে নগেন গর্জ্জন বন্ধ ক'রে সাদরে অভ্যর্থনা করল। নিজে মমতাদির পিঁড়িটা একটানে কেড়ে নিয়ে ব'সে আমায় টুলে বসাল। বলল যে, আমার জন্য তার নাকি বড়ই মন কেমন করছিল। মমতাদি শুধু একটু হেসেই আমায় স্বাগত জানাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাঁচু কাঁদচে কেন?

নগেন বলল, ও শূয়ারকা বাচ্চার কথা বোলোনা ভাই। হারামজাদা দু'একবছরের মধ্যে জেলে ঢুকবে। এই বয়সে এমন পাকা চোর হয়ে উঠেছে যে, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। চুপ করলি পাষণ্ড ইষ্টুপিড নারকী? চুরি ক'রে মার খেয়ে কাঁদিস, তোর লজ্জা নেই?

আমি পাঁচুর দিকে চেয়ে দেখলাম, চোরের সাজাই হয়েছে বটে। পিঠময় অসংখ্য শাস্তির চিহ্ন, পাশে পড়ে আছে একটা ভাঙ্গা বাখারি। নিজের চোখকানকে আমার বিশ্বাস হল না। মমতাদির ছেলে চোর!

বললাম, কি চুরি করেছে?

নগেন বলল, পয়সা। খাবার নয়, খেলনা নয়, পয়সা। তাও কি আমাদের পয়সা? ওই ওদের—ব'লে আঙ্গুল দিয়ে দোতালাটা দেখিয়ে

দিল। বালিশের তলা হাতড়ে পাঁচসিকে চুরি ক'রে পালাচ্ছিল, যাদব বাবু দেখতে পেয়ে চোর ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—সঙ্গে যাচ্ছেতাই গালাগালি।

আমি চকিতে মমতাদির দিকে তাকালাম। সে মাথাটা এত নীচু করে ছিল যে মুখ দেখতে পেলাম না। শুধু চোখ পড়ল, তার কাগজের মত সাদা কপাল, আর খোকার চোখে কাজল দিতে আঙুলের থর থর কম্পন। দেহ তার নিস্পন্দ, নতমুখী মর্ম্মর মূর্ত্তির মত।

যা, দূর হয়ে যা সামনে থেকে কুলাঙ্গার!

নগেনের গর্জ্জন শুনে চমকে ফিরে চেয়ে দেখলাম, পাঁচু কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন গুটি গুটি বাইরের দিকে চলেছে। তার সেই ধীর চলন দেখে নগেনের বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুতি হল, হাতের কাছে খড়ম ছিল একপাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। খড়মটা পাঁচুর গায়ে লাগল না, ওদিকের দেয়ালে ঠেকে বোলা ভেঙ্গে পাঁচুর পায়ের কাছে ছিটকে এল। পাঁচু দাঁড়াল। খড়মটা তুলে নিয়ে জিভ বার ক'রে ভেংচি কাটল। তারপর বাপের মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিতাপুত্র দুজনেই লক্ষ্যভেদে বিশেষ অপটু দেখলাম। খড়মটা নগেনের মাথায় না লেগে শোবার ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

নগেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু উটের মত লম্বা পা থাকা সত্ত্বেও তখনকার মত অদৃশ্য পলাতককে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা নেই জেনে ফিরে এসে পিঁড়িতে বসে পকেট থেকে বিড়ি বার ক'রে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্রোধ-বিকৃত মুখে এমন একটা উদাসীন ভাব এনে ফেলল যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিড়ির ধোঁয়া যে রাগের এমন ভাল ওষুধ তা জানা ছিল না।

খানিক বিড়ি টেনে নগেন বলল, ঠাকুর কেমন রাঁধছে গো সুরেশ বাবু? ওর রান্নার মত হচ্ছে?

ঠাকুর পালিয়েছে।

নগেন সোজা হয়ে বসে ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, সত্যি পালিয়েছে? তবে ওকে আবার রাখনা?

আমি সংশয়ভরে বললাম, দিদি কি আর কাজ করবে?

দিদি মুখ তুল্‌ল। ভাবলেশহীন মুখ। ভাবের শুধু অভাব নয়, ভাবগুলি যেন মুখেই মরেছে এমনি। নীরস স্বরে বল্‌ল, না ভাই, দিদি আর কাজ করবে না।

নগেন চটে বলল, কি করবে তবে শুনি? বসে বসে গিলবে? যার তার বাড়ী নয়, আত্মীয়ের বাড়ীর মত। সেখানে কাজ করতে তোমার আপত্তিটা কি শুনি? ওসব বজ্জাতি চলবে না, বুঝলে? আমি কুড়েমির প্রশ্রয় দেবনা! কাল থেকে তুমি কাজ করতে যাবে। মাসে পনেরটা টাকা সহজ নাকি? এবার বরং দুটাকা বেশী হবে। হবে না খোকা?

আমি সায় দিলাম, হবে।

মমতাদি কথা কইল না। রাগে আগুন হয়ে নগেন বলল, যাবে না তুমি?

না।

না? বটে? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করব আর তুমি ব'সে ব'সে খাবে, না?

স্বামীর রোজগার খেলে স্ত্রী বুঝি বেয়াদব বেহায়া হয়? ওমা, কি লজ্জা! এমন কথা আর বোলোনা, মানুষ হাসবে।

নগেন বলল, হুঁঃ, বজ্জাতি হোথা হায়! শুনবে তবে? শুনবে

তবে ? দু পয়সা রোজগার ক'রে স্বামীর একটু সাশ্রয় করার সুযোগ যে মেয়েমানুষ হেলা করে সে শুধু বেয়াদব নয়, সে-সে—

সে ?

সে বেশ্যা ! বলে নগেন ফের একটা বিড়ি ধরাল।

মমতাদির ধৈর্য্য ও সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে সে চুমা খেল, গাল টিপে আদর করল, খোকার হাসির জবাবে হাসল, শেষে অবসর মত বলল, তাই নাকি ? তা বেশ।

মমতাদি ঘরে চ'লে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে ক্রোধে মুহ্যমান স্বামীর গা ঘেঁষে বসে পড়ল। নগেন খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল, তারপর নড়ে চড়ে বার কয়েক আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখল। সে সময় তার মুখখানা এমন অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছিল যে, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। এটা বাইরের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম কিম্বা অন্তরের অনুভূতি দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম আজ সঠিক বলতে পারি না। কারণ, তার বসার ভঙ্গিটা ছিল বিচ্ছিরি—আদুরে গোপাল হ্যাংলা মেয়ের মত, মাথাটা একদিকে কাত করে সে দুষ্টামির হাসি হাসছিল, আবার এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, সে ইচ্ছে করে লজ্জায় একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে। নগেনকে লুব্ধ ক'রে সে যেন কি ভিক্ষা চাইছিল। এ সবের সঙ্গে তার পূর্ব্ব পরিচয়ের সামঞ্জস্য ছিলনা, তাই সমস্ত মিলে সে আমার কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্ব্বোধ্য ও অপূর্ব্ব।

আমার অস্তিত্ব সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় স'রে বসতে গেল। নগেন খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। তারপর এতক্ষণ যত রাগ জমা হয়েছিল তার সবটুকু ঝাল ঝাড়ল নির্দ্দোষী আমার ওপরেই !

হাঁ করে কি দেখছিস শুনি ? মজা লাগছে দেখতে, না ? বেরো আমার বাড়ী থেকে, বেরিয়ে যা !

মমতাদির চাকরীর খাতিরে আমার খাতির, সে যখন চাকরীই করবে না তখন আর কিসের খাতির ! তিলেক বিলম্ব না করে আমি বেরিয়ে গেলাম। সদর দরজাটা ভেজিয়ে দেবার সময় দেখলাম মমতাদির শুভ্রশীর্ণ হাত নগেনের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

মহাকালের জটার জট

মেজ মেয়ে সুমিত্রার বিবাহ আগামী শ্রাবণে। বড় মেয়ে সুচিত্রা আধ বোবা, আধ কালা, আধ পাগল।

তাহা সত্ত্বেও পাত্র খুঁজিতে হয়। জোটে না, তবু খুঁজিতে হয়। শেষে না কাঁদিয়া মেয়ে দেওয়া যায় এমন একটী সম্বন্ধ মামার চেষ্টায় প্রায় স্থির হইয়া আসে এবং একদিন বেলা ১০টায় পাত্রপক্ষ সদলে মেয়ে দেখিতে শুভাগমন করেন।

তারপর যাহা ঘটে তাহা যেমন অচিন্তনীয় তেমনি বীভৎস। অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় উঠানে গড়াগড়ি দিয়া সুচিত্রা চীৎকার করিয়া কাঁদে। মরিয়া গেলেও দু'বার বিবাহ সে কিছুতেই করিবে না, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় পাগল মেয়েটার যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

যাঁহারা মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন খানিকক্ষণ মজা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া তাহারা প্রস্থান করেন। উপস্থিত সকলের মুখে মেঘ ঘনাইয়া আসে। কাহারো মুখে কথা ফোটে না, কেহ কাহারো মুখের দিকে চাহিতে পারে না। খানিক আগেইতো সুচিত্রার অনাবৃত দেহটা সকলের চোখে পড়িয়াছে। মেয়েটার অস্তিত্বে ফাঁক আছে, কিন্তু অঙ্গের কোথাও ফাঁকি নাই। ওর সম্বন্ধে এ যেন একটা নূতন চেতনা নিয়া জাগিয়া ওঠা।

সুলতা ননদকে শান্ত ও সংযত করিয়া দিতেছিল, প্রশ্নকামী মামাশ্বশুরের

নৈকট্য পরিহার করিয়া সে এদিকে সরিয়া আসিল। সুমিত্রাকে চুপি চুপি বলিল 'ওকে মিথ্যে জ্বালাতন করা মেজ ঠাকুরঝি।'

এদিকে মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া মামা অতিকষ্টে সুচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দু'বার বিয়ে কিরে চিত্রা? তোর আবার বিয়ে হ'ল কবে?'

চোখ মুছিতে মুছিতে করুণ সুরে সুচিত্রা বলিল 'হয়েছে মামা। ও রোজগার করেনা বলে তোমরা আবার আমার বিয়ে দেবে?'

'সে কে রে? কার কথা বলছিস্?'

সুচিত্রা নীরবে মাথা নাড়িল।

'কে রোজগার করেনা?' মামা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বহু জিজ্ঞাসাবাদেও সুচিত্রার অক্ষম স্বামীর পরিচয় জানা গেল না। সে বলিবে না। স্বামী তাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত মামা হাল ছাড়িয়া দিলেন। একে কুমারী মেয়ে তায় আবার পাগল, ইহার মনের কথা বাহির করিবার মত বুদ্ধি তাঁর মত অবিবাহিত লোকের নাই। একটা বিড়ি বাহির করিয়া তিনি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অত চেষ্টা যত্নে যোগাড় করা সম্বন্ধ ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না।

আহা, এই পাগল মেয়েটাকে তিনি কত ভাল ব্যাসেন! তারই মায়ের পেটের বোনকে তিনদিন যন্ত্রণা দিয়া যমের দক্ষিণ দুয়ারের কাছাকাছি লইয়া গিয়া এ মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। ইহার বিবাহ দিতে পারিলে তার কত সুখ হইত শুধু ভগবানই তাহা জানেন।

ও বাড়ীর যাদব মেয়ে দেখানো ব্যাপারে সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন, সুচিত্রার নগ্নতা চোখে পড়ামাত্র তার দৃষ্টি নিজের বাড়ীর

কার্নিশে উঠিয়া গিযাছিল, এতক্ষণে চোখ নামাইযা তিনি চারিদিকে চাহিযা দেখিলেন। সুলতার কাছে আগাইযা গিযা বলিলেন, 'এ নিশ্চয় পাগলামী ছোট বৌ।'

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, 'তা ছাড়া কি ?'

কাঁচা-পাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা আরম্ভ করিযা যাদব চিন্তিত-ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। সুলতার কথায় যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেও জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহাকে যেন বিচলিত করিযা তুলিয়াছে। বিশ্বাস করেন না কিন্তু এ রহস্য যেন তিনি চিনেন।

সরমা পাথরের মূর্ত্তিব মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সুলতার সঙ্গে যাদবকে কথা কহিতে দেখিযা তার যেন চেতনা হইল। বৌকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন 'চিত্রা এসব কি বলছে ছোট বৌ? তুমি কিছু জান ?'

এ বাড়ীর সকলকেই সুচিত্রা পরিহার করিয়া চলে কিন্তু কি কারণে বলা কঠিন। সুলতার সঙ্গে তার ভাব আছে। এ বাড়ীতে সুলতার দুপুরগুলিই বিনিদ্র। সাত মাসের ভ্রূণের ভারে তাহার পদক্ষেপ মন্থর, কিন্তু সারাটী দুপুর সে এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়ায়। চঞ্চল সে নয়, কিন্তু চুপ চাপ বসিয়া থাকিতে তরুণী বধূটির যেন দারুণ অস্বস্তি।

সুচিত্রার গোপন পরিণয়ের সংবাদ যদি কাহারো জানা থাকে, তবে সুলতার থাকাই সম্ভব। কিন্তু সুলতা কিছুই জানে না।

শ্বাশুড়ীর প্রশ্নের জবাবে সে মৃদুস্বরে বলিল 'জানিনে মা। ও বাড়ীর পঙ্কু ছাড়া ঠাকুরঝিতো কারও সঙ্গে কথা কয় না।'

শুনিয়া সরমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। পঙ্কু ছেলে মানুষ, স্কুলে পড়ে। সরমার ছোট ছেলেটী বাঁচিয়া থাকিলে অত বড়ই হইত এতদিনে।

সুচিত্রার বিকৃত মনে এই ভাইটির জন্য কেমন করিয়া একটা আশ্চর্য্য প্রখর মমতা জন্মিয়াছিল, খুব সম্ভব সেই ভালবাসাই এখন পাশের বাড়ীর গম্ভীর প্রকৃতি ছেলেটীর উপর পড়িয়াছে; পাগল মেয়ের অন্ধ উগ্র ভালবাসা। প্রকাশটি বিচিত্র। পাঁচুর স্কুল বন্ধ থাকার দিনটীর প্রতীক্ষায় সুচিত্রা ছট্‌ফট্‌ করে, অন্যদিন তার কাছে পাঁচুব বেশীক্ষণ থাকা নিষেধ, তাড়াতাড়ি লেখা পড়া শিখিয়া পাঁচু মানুষ হোক্ সুচিত্রার এই আগ্রহ একেবারে নিষ্ঠুর। ছুটির দিন দুপুবটা পাঁচু তার কাছে থাকে। সকালে পঙ্কুর পড়া চাই, বেশ মনোযোগ দিয়া পড়া চাই, সুচিত্রার মাথার দিব্যি।

খাওয়া দাওয়ার পর এগারটা কি বারটার সময় সলজ্জভাবে পঙ্কু আসিয়া দাঁড়ানমাত্র তাহাকে ভিতরে নিয়া গিয়া সুচিত্রা ঘরে দুয়ার দেয়। পাঁচটা অবধি ছেলেটিকে লইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সোহাগ করিয়াও তার যেন তৃপ্তি হয় না।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা তাহার এমনিই দুর্ব্বোধ্য, পঙ্কুকে সোহাগ করিবার সময় তাহা এত বেশী জড়াইয়া যায় যে বাহির হইতে শুনিলে মানে বুঝা যায় না। কিন্তু সুরটা এমন করুণ যে চোখে জল আনিয়া দেয়।

যাদবেব বড় ছেলে সতীশ ম্লানমুখে সরমাব মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সরমাকে চোখ মুছিতে দেখিয়া সে আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না!

'মিছামিছি কেন কাঁদছেন মাসীমা? ওর কথার কি কোন দাম আছে?'

সতীশের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। সবমার চোখে মুখে ব্যথা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। সতীশের সহানুভূতি তার সহ্য হয না। বুকের মধ্যে কেমন করে। সতীশ আবার বলিল 'আপনার হার্ট দুর্ব্বল, এ রকম অধীর হবেন না মাসীমা।'

সরমা শ্বাস টানিয়া বলিলেন 'আমার বুক ধড়ফড় করছে সতীশ।'

সতীশ চমকাইয়া উঠিল 'বুক ধড়ফড় করছে! এরা দেখছি আপনাকে বাঁচতেই দেবে না মাসীমা। চলুন, আপনি একটু শুয়ে থাকবেন।'

'এইখানে একটু বসি, সতীশ।'

'সে হবেনা মাসীমা, আপনাকে শুতে হবে!' সতীশ ঘরে ঢুকিয়া মাদুর ও বালিশ আনিয়া বিছাইয়া দিল। সরমা ম্লানভাবে একটু হাসিলেন। মমতায় ছেলেটা পাগল। ওর চোখের দিকে তাকাইতেও যেন ভয় করে।

হেমন্ত ছোট ছেলে, সুলতার স্বামী। ঝড়ের মত বাড়ীতে ঢুকিয়া সে বলিল, 'ব্যাটাদের আচ্ছা করে গালাগালি দিয়ে এলাম, মামা। পাগল মেয়ে দেখতে তার পাগলামি দেখে হাসবে, একি ইয়ার্কি নাকি?'

সুলতা ঘোমটা একটু টানিয়া দিল, লজ্জায় নয়, মুখের ভাব গোপন করিবার জন্য। সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ দাদা, রাস্তায় ভিড় জমেছিল? গালাগালি শুনে পথের লোক প্রাণভরে খুব হেসেছিল?'

অযথা পরিমাণে হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া হেমন্ত বলিল, 'না, হাসবে কেন?'

সুলতা তীব্র চাপা গলায় সুমিত্রাকে বলিল, 'বলনা, মেজো ঠাকুরঝি, ওঁর ভঙ্গি দেখে আমাদের সকলের হাসি পাচ্ছে, পথের লোক হাসি চেপে রাখবে কোন দুঃখে।'

'ও বাবা ও কথা বলি আর বুড়ো বয়সে পিটি খেয়ে মরি আর কি! বলতে হয় তুমি বল।' বলিয়া সুমিত্রা মুখ বাঁকাইল। সুমিত্রার বিবাহ হয় নাই। তার বিবাহ আগামী শ্রাবণে।

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল 'বলার অধিকার আমারি পুরো বটে।'

যাদব আনমনে সুলতার নিকটে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সুলতার কথাগুলি তিনি শুনিতে পাইলেন। হেমন্তকে তাঁর কিছু বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু সুলতার ইচ্ছা তার ভীরুতার চেয়ে বড়ো। মুখখানা যথা সম্ভব গম্ভীর করিয়া হেমন্তকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন 'এ দুর্ব্বুদ্ধি আবার তোমার মাথায় চাপল কেন হেমন্ত? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে গাল দেবার বয়স তোমার পার হয়ে গেছে বাপু।'

এক মুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্ধতভাবে হেমন্ত জবাব দিল, 'তাই যদি গিয়ে থাকে আপনার উপদেশ শুনবার বয়সও বোধ হয় আমার পার হয়ে গেছে কাকা।'

'ও, আচ্ছা।' বলিয়া যাদব মুখ ফিরাইয়া নিলেন। দেখিতে পাইলেন সুলতা অনভ্যস্ত দ্রুতপদে ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দাড়িকে যাদব জোরে মুচড়াইয়া দিলেন। ভাবিলেন, একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মতই আছে, কিন্তু ছেলেগুলি হইয়াছে উদ্ধত, দুর্বিনীত, পাষণ্ড। ইহাদের ধরিয়া চাবকানো উচিত। ইহাদের মৃত্যু হইলে পৃথিবীর মঙ্গল।

যাদবের বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ ঘা লাগিল। সুলতার খুব শুভাকাঙ্ক্ষী তো তিনি! দাড়ি আর তিনি মুচড়াইলেন না, হঠাৎ রাগের বশে যাহা ভাবিয়া বসিয়াছেন মনে মনে তাহারি জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

ও বাড়ীর ছাদের কার্ণিশে একটা চিল আসিয়া বসিয়াছে। পিঠ তাহার রোদে পুড়িয়া গেল বুকে কিন্তু নিজের দেহেরই ছায়া।

এ বাড়ীর ছাদে চিলে কুঠির ছায়ায় বসিয়া হেমন্ত আকাশে ঘুড়ি

উড়াইতেছে। ঘরের জানালা দিয়া একটা সুদূর সাদা মেঘের গায়ে দুর্লক্ষ্য কালো বিন্দুর মত স্বামীর ঘুড়িটা সুলতার চোখে পড়িল।

তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। আজ সে বাপের বাড়ী যাইবে, আজিকার দিনেই ছাদে গিয়া হেমন্ত ঘুড়ি উড়াইতে বসিয়াছে এ জন্য নয়, স্বামীর এই ছেলেমানুষীর পরিচয়ে তাহার চিন্তা যে জীবনের সীমা পার হইয়া স্বর্গীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইল, ইহার আতঙ্কে। এখন এভাবে বাবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলে বিকাল পর্য্যন্ত তার সময় কাটিবে কি করিয়া ?

বাবাকে সুলতা বড় ভালবাসিত। সতের বছর বয়স পর্য্যন্ত পিতার স্নেহের মূল্যে নিজের সমস্ত জীবনটা সে বিলাইয়া দিয়াছে, গাঢ় সুমিষ্ট মধুর তলে তার যেন আকণ্ঠ সমাধি। তুলিয়া আনা সত্ত্বেও মধুপাত্রে নিমজ্জিত মক্ষিকার মত এখনো সে মধুর বন্ধন সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। এবং তারি ফলে অনড় অচল স্থবির তাহার জীবন, অচেনা অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে তাই তার একা বাঁচিয়া থাকা।

বাবাকে মনে পড়িলে এই বৃন্তচ্যুতির অনুভূতি সুলতার অসহ্য হইয়া উঠে। মনে হয়, জীবনে পাড়ি জমাইবার জন্য ছোট একটা ডিঙ্গিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া জাহাজ নিয়া পিতা তাহার চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন,—এ ডিঙ্গি সামনেও আগায় না ডুবিতেও চায় না, এ পারের তীরের কাছে অল্প ঢেউয়ে টলমল করে। বাস্তবিক, জীবন এখানে এমন অগভীর যে খেয়া ডিঙ্গি চড়ার বালিতে ঠেকিয়া গিয়াছে বলিয়াই সুলতা সন্দেহ করে।

হেমন্তর অপরাধ নাই, তার প্রকৃতিই ওই রকম। সে যেন বয়স্ক শিশু, দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্ব্বোধ। ওর জন্য কতদিন লজ্জায় সুলতার মাথা কাটা

গিয়াছে তার হিসাব নাই। বাড়ীর সকলে যখন গম্ভীর মুখে একটা গুরুতর সাংসারিক সমস্যা নিয়া আলোচনা করে, পরামর্শ দিবার জন্য ওবাড়ীর যাদবকে পর্য্যন্ত ডাকিয়া আনা হয়, মাঝে মাঝে কি অদ্ভুত হাস্যকর মন্তব্যই হেমন্ত করিয়া বসে! সুমতি পর্য্যন্ত দাদার বয়সটা অগ্রাহ্য করিয়া বলে 'আবল তাবল কি বকছ দাদা?'

হেমন্তর রাগ আছে ষোল আনা।

বলে, 'তোর কি রে বেয়াদব মেয়ে।'

তখন গুরুজনের মধ্যে কেউ ভয়ে ভয়ে বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখের কথা অমনভাবে তুচ্ছ করতে নেই হেমন্ত!'

'বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল? বয়ে গেল কিরে! দাদা থাকে বিদেশে, তুইতো এখন সব দেখবি শুনবি? তোর ওপরে তো সব ভার।'

কোণ ঠাসা হইয়া হেমন্ত একটু মুখ বাঁকায় মাত্র, কোন জবাব দেয়না।

আড়ালে সুলতার গা রাগে রি রি করে। ছেলের মত যাকে শাসন করিতে ইচ্ছা হয়, তার স্বামীত্বের লজ্জা কোথায় লুকাইবে সে ভাবিয়া পায়না।

এ লজ্জা চিরদিনের। সিঁদুর যদি না মুছিয়া যায়, পাকা চুলেতো এ কলঙ্ক ঢাকা পড়িবেনা। শিশু তার কর্ত্তা, শিশু তার ভর্ত্তা, শিশুর সে অঙ্কশায়িনী।

সুলতা বাক্স গোছানর অসমাপ্ত কাজে ব্যাপৃত হইবার চেষ্টা করিল। দু'খানা কাপড় গুছাইয়া রাখিতেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। হাত গুটাইয়া সে চুপচাপ বসিয়া রহিল।

এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইল পঙ্কু।

কি বলিতে গিয়া লাজুক ছেলেটী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুলতা বলিল 'কি ভাই ?'

'আপনি আজ চলে যাবেন ?'

'যাব। স্কুল পালিয়ে তুমি বুঝি আমায় তাই দেখতে এলে ?'

পঙ্কু অস্বীকার করিয়া বলিল, 'না।'

'না কি ভাই ?'

'ক্লাসে থাকতে ভাল লাগেনা তাই চলে এলাম।'

সুলতা খুসী হইয়া বলিল, 'অন্য ছেলে হ'লে বলত হ্যাঁ তোমাকে দেখতে এলাম। ছেলের দল থেকে তুমি বড় তফাৎ হয়ে গিয়েছ ভাই। কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য স্কুল কামাই করলে, আমার জন্য পারনা ?'

সুচিত্রার স্নেহের মর্য্যাদা রাখা যেন অপরাধ এমনিভাবে পঙ্কু হাসিবার চেষ্টা করিল। সুলতা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল 'তোমার হাসি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে যেন জ্যোতি নেই। খেলা ধুলা করনা বুঝি ? অল্প বয়সে এত বুড়ো হয়ে গেলে, বেশী বয়সে বাঁচবে কি করে পঙ্কু ?'

সরমা কতকগুলি কারুকার্য্যখচিত কাঁথা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি ভাঁজ করিয়া ট্রাঙ্কে ভরিয়া সুলতা আবার বলিল, 'এই বয়সে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, আর বুড়ো বয়সে ও কত ছেলেমানুষ জানালা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখো ভাই। আমি আজ চলে যাব, ঘুড়ি দিয়ে উনি তাই মেঘ শিকার করছেন।'

'আপনি বারণ করেননা কেন ?'

'বারণ করলে কে শুনছে ?'

'আপনার বারণ শোনেনা !'

বৌ বারণ করিলে কথা শোনেনা এরকম মানুষ যে পৃথিবীতে থাকিতে পারে পঙ্কুর এ ধারণা ছিলনা। কথা না রাখিলে বৌ কাঁদে, বৌয়ের কান্না হেমন্ত সয় কি করিয়া ?

'আপনি খুব কাঁদেননা কেন ?'

'ওমা, কাঁদব কি জন্ম ?'

পঙ্কু আরও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছেনা! এমন সময় সুচিত্রাকে আসিতে দেখা গেল। সুলতা বলিল 'তোমার দিদি আসছে পঙ্কু।'

ঘরে পা দিয়া কথাটা কানে যাইতেই সুচিত্রা চটিয়া উঠিল।

'গেঁয়ো মেয়ের মত কি ঠাট্টাই যে তুমি কর বৌদি! অন্ত ননদ হলে গালে ঠোনা মারত। ছি ছি, ও কথা বলতে আছে ?'

সুলতা ভয়ে ভয়ে বলিল 'আর বলবনা ঠাকুরঝি।'

সুচিত্রা এ কথা শুনিতে পাইলনা। হঠাৎ তার মনে একটা নুতন খেয়াল জাগিয়াছে। মুখের উপর হইতে রুক্ষ চুলের রাশি সরাইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে সে সুলতার সীঁথির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি দেখিয়া সুলতা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'অমন করে চেয়ে কি দেখছ ঠাকুরঝি ?'

সুচিত্রার যেন চমক ভাঙ্গিল। লজ্জা ও বেদনায় অপরূপ মুখভঙ্গি করিয়া সে বলিল, 'আজ পর্য্যন্ত এ তো আমার মনেই পড়েনি বৌদি! দেখেছ মেয়ে মানুষের মন ? কি লজ্জা, মাগো।'

পঙ্কুকে বলিল 'আমার ঘরে গিয়ে একটু বসগে যাওতো। আমি এখনি আসছি।'

অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত মুখ করিয়া পঙ্কু সরিয়া গেল।

সুলতার পাশে বসিয়া নালিশের সুরে সুচিত্রা বলিল, 'তুমিওতো এতদিন মনে করে দাওনি বৌদি ?'

'কি মনে করে দিইনি ভাই !'

নিজের সীঁথি নির্দ্দেশ করিয়া সুচিত্রা বলিল, 'সিঁদুব পরার কথা। দেখ দিকি, এই অমঙ্গলের ধ্বজা উড়িয়ে, এয়োস্ত্রী মানুষ আমি সকলের সামনে বা'র হয়েছি। তোমাদের কি চোখ নেই ?'

সুলতা তাহার সীঁথি আবিষ্কার করিতে পারিলনা, এলোমেলো চুলের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অস্তিত্বহীন কাল্পনিক স্বামীর মত এও যেন পাগল মেয়েটার কৌতুক।

'দাও বৌদি আমায় সিঁদূর পরিয়ে দাও।'

'আজ থাক্ ঠাকুরঝি, ভালো দিন দেখে পরো।'

'না, আজকেই দাও। হাতে নোয়া নেই, শাঁখা নেই, একটু সিঁদূরও পরবনা ? এমন করলে ও আমায় ত্যাগ করবে। সারা গায়ে এত অমঙ্গলের চিহ্ন কি কেউ সইতে পারে ?'

আগে চুল আঁচড়ে বেঁধে দিই, তারপর সিঁদূর পরবে। গা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে সিঁদূর পরতে হয় ঠাকুরঝি।'

সুলতাও যেন পাগল। কুমারী মেয়ের কপালে খানিকটা লাল গুঁড়া লাগাইতে তার আপত্তির অন্ত নাই। এ বিষয়ে তার মনে উদারতার একান্ত অভাব। এয়োতির চিহ্ন নিয়া ছেলেখেলা সে ভালবাসেনা।

সুচিত্রা অধীর হইয়া বলিল 'আমার অত সময় নেই বৌদি। এখনি পরিয়ে দাও। বেশী বাহাদুরী তোমার না করলেও চলবে।'

না দিয়া উপায় নাই। সুলতা সিঁদূরের কৌটা খুলিয়া আনিল। টিপ পরাইয়া দিতে গিয়া তাহার মনে হইল ইহার এই অর্থহীন খেয়ালটা

সত্য ভাবিয়া না নিলে আর কোনমতে চলিবেনা। হিসাব করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় তার চেয়ে এই স্বামীহীন মেয়েটা স্বামী ভাগ্যে কম ভাগ্যবতী নয়। শূন্যকে ভালবাসিয়া ইহার নালিশ নাই, বেদনা নাই, একেবারে মশগুল হইয়া আছে। জাগিয়া থাকার সময় নিজের স্বামীপ্রেমে নিজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, ঘুমাইয়া স্বামীর স্বপ্ন দেখে। এ ব্যাপারটা সুলতার বড় রহস্যজনক মনে হয়। পাগলের জাগ্রত অবস্থাটাই স্বপ্ন, স্বপ্নের অবস্থাটা কেমন ভাবিতেও পারা যায়না।

সিঁদুর পরিয়া সুচিত্রা সুলতাকে প্রণাম করিল। এক পা পিছাইয়া গিয়া সুলতা বলিল 'বেঁচে থাক ভাই, স্বামী সোহাগিনী হও।'

দেখিতে দেখিতে সুচিত্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

'সেই আশীর্ব্বাদই কর বৌদি। ও ত্যাগ করবে বলে আমার আজকাল এমন ভয় করে।'

'ত্যাগ করবে কেন?'

সুচিত্রা ভারি লজ্জা পাইল। এদিক ওদিক চাহিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল 'ছেলে মেয়ে হলনা যে? ও বলে নাইবা হল ছেলে মেয়ে, চাকরী করে আমি তোমায় ছেলে কিনে দেব। তাতে কিন্তু ভরসা পাইনা বৌদি।'

সুলতার নিশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল।

'চাকরী করে তোমায় ছেলে কিনে এনে দেবে বলেছে?'

'বলেছে। কিন্তু তবু আমার ভয় করে। কেনা ছেলেকে কেউ ভালবাসতে পারে?'

সুচিত্রা নিজের মনে মাথা চালিতে লাগিল। চোখ তুলিয়া সুলতা দেখিতে পাইল দরজার কাছে পঙ্কু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন

অকূলে কূল পাইল। উঠিয়া কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'পঙ্কু ভাই, ওকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও। ও আমাকে পাগল করে দেবে।'

পঙ্কু রুক্ষস্বরে বলিল, 'কেন? ওতো আপনার কোন ক্ষতি করেনি?'

'কি বলছ পঙ্কু?

'আপনার বড় হিংসা।'

বলিয়া সুলতার উপর রাগ করিয়াই যেন কড়া সুরে পঙ্কু সুচিত্রাকে ডাকিল, 'এখানে বসে হচ্ছে কি? চলে এসো।'

'যাই।'

একান্ত অনুগতভাবে সুচিত্রা তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। সুলতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিংসাও তাহার একটু হইল বৈকি। কচি লঙ্কা চিবাইতে ঝাল যত না লাগে তেতো লাগে তার চেয়ে ঢের বেশী, পনের বছরের একটা অপরিপক্ক ছেলের ধমকে তার বুকের মধ্যে তেমনি অল্প অল্প জ্বালা করিতে লাগিল. সমস্ত মন তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। হোকনা ছেলেমানুষ, পুরুষতো বটে—কেউটের বাচ্চা। মায়ের কোলে ওরা বিষাক্ত হইয়া উঠে। নইলে তার উপরে চোখ রাঙাইবার আত্মবিস্মৃতি মুখচোরা লাজুক ছেলেটার কেমন করিয়া হইল?

সুলতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঙ্কুর সঙ্গে কথা বলিবেনা।

ঘরে আর থাকিতে ইচ্ছা হইলনা। নিজের যাত্রার আয়োজন নিজের হাতে করা যে কি কষ্টকর সুলতা এতক্ষণে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে।

ও বাড়ী যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়া সুলতা নীচে নামিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ও সুমিত্রা। সুমিত্রার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ভাল নয়।

প্রথমে সুমিত্রা ভয়ানক চমকিয়া উঠিল। তারপর পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অকম্পিত হস্তে একটি একটি করিয়া ব্লাউজের বোতাম লাগাইল। কোনদিকে না চাহিয়া সে উপরে চলিয়া গেল। সতীশ মাথা নীচু করিয়া বলিল, 'মাসিমা কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম বৌদি।'

'মা ভালই আছেন।'

একথা অবান্তর। এ প্রশ্নোত্তরের মানে আছে, সঙ্গতি নাই।

সতীশ একটু ইতস্তত: করিয়া কৈফিয়ৎ দিল।

ছেলে বেলা আমি সুমিত্রার বুকে একটা ফোঁড়া কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দাগটা আজ আমায় দেখিয়েছিল।

'কেন?'

'দাগটা যেন ভুলে না যাই।'

'এমন! একি তাহলে আপনার উচিত হচ্ছে ঠাকুরপো?'

সতীশ বিবর্ণ হইয়া বলিল 'কি করব বলুন? আমি নিরুপায়। আমার মনের কি যেন একটা অসুখ আছে বৌদি। সুমিত্রাকে আমার মেয়ের মত মনে হয়।'

'মেয়ের মত মনে হয়! আপনার মাথা খারাপ নাকি?'

সতীশ অপরাধীর মত হাসিল।

'কি জানি, হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মেয়ে মনে করলেই সুমিত্রাকে আমি খুব সুন্দরী দেখি, আর কিছু মনে করতে গেলে, ও কদর্য্য কুৎসিত হয়ে যায়। ও বড় রোগা আর বড় ছেলেমানুষ।

'সবাই বলে সুমিত্রার মত সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। ওর মার চেয়েও সুমিত্রা সুন্দর হয়েছে।'

সতীশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার মনে হয় সবাই ভুল বলে বৌদি। মাসীমা যখন প্রথম এখানে আসেন, আমার বয়স ছিল নয় কি দশ। সেই বয়সে আমি যে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম এখনো মনে আছে। সারাদিন ওর আশেপাশে ঘুরতাম।

সুলতা বলিল, 'তা সত্যি। মাকে এখনো জগদ্ধাত্রীর মত দেখায়। মোটা হয়ে পড়েছেন নইলে—'

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, 'ওইটুকু মোটা না হ'লে ওকে মানাত না বৌদি।'

'তা হয়ত মানাত না, কিন্তু বয়স আন্দাজে সুমিত্রাতো রোগা নয়। দিব্যি ছিপছিপে গড়ন।'

সতীশ হাসিয়া বলিল, 'ননদ কিনা, ওর সবই আপনার ভাল লাগে। কি রকম হাবলা দেখলেনতো? বার বার বললাম, দাগের কথা আমার মনে আছে সুমিত্রা, দেখাবার কোন দরকার নেই, কথা শুনল না।' বলিয়া সতীশ গম্ভীর হইয়া গেল, ওষ্ঠের প্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'বাপের জন্য সুমিত্রা দেখতে খারাপ হয়েছে।'

'তিনি বুঝি দেখতে ভাল ছিলেন না?'

সতীশ সজোরে মাথা নাড়িল 'বিশ্রী। নাক বোঁচা, চোখ ছোট, রং কালো—দেখে আমার হাসি পেত। আফিস থেকে এলে কেন যে ছুটে কাছে যেতেন ভেবে আমি অবাক হয়ে যেতাম। একদিন কি মজা হয়েছিল শুনুন—'

বিবর্ণ মুখে সুলতা শুনিল। হেমন্তের সঙ্গে সতীশ উঠানে ক্রীকেট

খেলিতেছিল। আপিস ফেরত হেমন্তের বাবা বারান্দায় বসিয়া জিরাইতে-ছিলেন, তাহাকে বাতাস করিতেছিলেন সবনা। হঠাৎ বল লাগিয়া হেমন্তের বাবার ঠোঁট কাটিয়া একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার।

রুদ্ধ নিশ্বাসে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, 'ইচ্ছে করে মেরেছিলেন নাকি ?'

সতীশ উদাসভাবে বলিল, 'কি জানি, মনে নেই। কিন্তু মবে যাবেন ভয়ে সারাদিন বুকের মধ্যে কেমন করেছিল, বেশ মনে আছে।'

'ভয়ে ?'

প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ চটিয়া উঠিল, 'তবে কি ? কি বলতে চান শুনি ? ভয়ে নয়তো কিসে বুক কেঁপেছিল ?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, ঠাকুরপো।'

সতীশ কথঞ্চিত ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, 'মাসীমা সেজন্য আমায় কিন্তু শাস্তি দিতে ছাড়েন নি, কান মলে দিয়েছিলেন। মনে পড়লে এখনো সেজন্য কান লাল হ'য়ে উঠে, মাসীমার ওপর অভিমান করতে ইচ্ছা হয়।'

সুলতা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। যে সব কথা তাহার মনে হইতে লাগিল, সতীশের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে গেলে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে।

দ্রুতপদে সে উঠান পার হইয়া গেল।

মনোরমার কাছে পৌছিবার পূর্ব্বে দেখা হইল যাদবের সঙ্গে।

সুলতার কুঞ্চিত ভ্রূ দুটি সরল হইয়া উঠিল, মুখের ক্লিষ্টভাব মিলাইয়া গেল! তার মনে হইল, আজ সারাদিন সকল কাজের ফাঁকে সকল দুশ্চিন্তার আড়ালে ইহার সঙ্গই সে কামনা করিয়াছে। যে শূন্যতা সারাদিন তাহাকে

আত্ম পীড়ন করিয়াছে, ইহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তাহা ভরাট হইয়া গেল।

'আপনার অম্বল হয়েছে শুনলাম, এখন কমেছে?'

যাদবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এই প্রশ্ন তাহার হাঁপ ছাড়ার মত শোনাইল। তাহা লক্ষ্য না করিয়াই যাদব বলিলেন, 'অম্বল কমেছে। তুমি বুঝি মনোর খবর নিতে এলে ছোট বউ? ওর কান্নাও আজ কমেছে।'

'এ সুখবর কাকা। মনো বড় বেশী কাঁদত।'

যাদব বলিলেন, 'ওটা দুর্ব্বল মনের লক্ষণ। মনের জোর না থাকলে আনন্দ যেমন পঙ্গু হয়, শোক দুঃখের তেমনি হয় বাড়াবাড়ি। একমাসের ছেলের মরণ ছোঁয়াচে নয়, ওযে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে সে রোগ ওর নিজের। ওর মনে আত্মনির্য্যাতনের প্রবৃত্তি আছে, মরণের প্রেরণা আছে। ছেলে মরার উপলক্ষটা ও কামনা করেছিল কি না কে জানে।'

মেয়ের মর্ম্মান্তিক বেদনা সম্বন্ধে যাদবের এই ভয়ানক মন্তব্যে সুলতা প্রীতিবোধ করিল। মেয়ের কান্নাকাটিতে যাদবের বিরক্তি যেন তারই ব্যক্তিগত লাভ। তবু অবিশ্বাসের ভান করিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে সে বলিল, 'কি যে বলেন তার ঠিক নেই। অমন কামনা কেউ করে?'

'করে না? তুমি কিছুই জান না ছোট-বৌ।' যাদব এক-প্রকার অদ্ভুত হাসি হাসিলেন। মনে হইল, তাহার বাক্-সংযম আজ একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস, সত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া তরুণী বধূটিকে তিনি আজ ভীতা করিয়া তুলিতে চান।

বলিলেন, 'জীবনের এদিকটা তোমার কাছে অন্ধকার ছোট-বৌ

বৈধব্যের রোমান্সের জন্য সব মেয়েই যে মনে মনে স্বামীর মৃত্যু কামনা করে এটা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে কঠিন।'

সুলতার অভিজ্ঞতা কম নয়। চোখ নামাইয়া সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, 'কঠিন নয়, বোধহয় কষ্টকর।'

তার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। যাদব তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আঙুলগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ তিনি কাঁচা পাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিয়া সুলতার মনে হইল আত্মসংযমের এই অতুলনীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে তার যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। একটা অবাস্তব কল্পনায় নিজের জীবনকে রূপকের রূপ দিয়া যাদবের পায়ে বিদায়ের প্রণামটা এখনি সারিয়া নিবার জন্য তার মন উন্মুখ হইয়া উঠিল। আকাশ-গঙ্গার মত শূন্য বাহিয়া ঝরিতে ঝরিতে এমনি একটি প্রাচীন মহাকালের জটায় একটি সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের কয়েক মুহূর্ত্তব্যাপী সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র অভিনয়।

যাদব বলিলেন, 'মনোর সঙ্গে দেখা করে এসো। আমি আমার ঘরে র'ইলাম।'

মনোরমার সংবাদ কিছুই অসাধারণ নয়। কাঁদিতে গিয়া আজ চোখ এত জ্বালা করিয়াছে যে বারবার কলের জলে চোখ ধুইয়া সে চুপচাপ বিছানায় বসিয়া ছিল।

কয়েকদিনের শোকেই শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক সুরে কথা বলিবার চেষ্টা আজই বোধ হয় তাহার প্রথম।

'বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ভাই। এত জল খেয়েছি তা

বলবার নয় তবু তেষ্টা মিটছে না। এমন ঘুমেও ধরেছে আজ, সারাদিন কেবল ঢুলেছি।'

সুলতা সায় দিয়া বলিল 'শরীরের ওপরে অত্যাচার তো কম হয় নি।'

'না, তা হয়নি।' মনোরমা একটা রঙীন উলের টুপি হাতে তুলিয়া নিল। উদাসভাবে বলিল, 'কিন্তু তা ছাড়া আমার বাঁচবার উপায় ছিল না ভাই। বুক ফেটে মরে যেতাম। খোকা তো শুধু আমার ছেলে হয়ে আসেনি; ওর মধ্যে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম, সাথী পেয়েছিলাম, প্রেমিক পেয়েছিলাম। বিয়ের পর উনি যেমন নিরাশ্রয় প্রেম নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন খোকা তেমনি ভাবে তাকাতে শিখেছিল। খোকা কাঁদলে আমার মনে হ'ত আমাকে জয় করবার চেষ্টায় উনি আবার মুখর হয়ে উঠেছেন। খোকার হাত গালে ঠেকলে ওঁর প্রথম দিনের স্পর্শ আমার মনে পড়ে যেত রোমাঞ্চ হয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়ত ভাই।'

সুলতা নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার মনে হইল এমনি ভাবেই সকলে নিজের আনন্দ ও বেদনাকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক মনে করিয়া থাকে বটে। সে ছাড়া আর কোন নারী যে কোন কালে সন্তানকে স্বামীর প্রতিনিধি করিয়া ভালবাসার অরাজক রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিয়াছে মনোরমা তাহা ভাবিতেও পারে না।

প্রথম পুত্রের মৃত্যু যে স্বামীপুত্র দুজনকে এক সঙ্গে হারানোর মত অসহ্য পৃথিবীতে মনোরমাই তাহা প্রথম জানিল।

শোক দুঃখের আগাগোড়ায় এ বেদনা তাই চিরস্থায়ী। ত্রিশ বছর পরে স্বামীর যৌবনকালের ফটো দেখিয়া মনোরমার মনের ভিতর হু হু করিয়া উঠিবে, মনে হইবে, এমনি চোখ, এমনি মুখ, এমনি অতুল

অতৃপ্ত হাসি নিয়া যে আজ তাহার নিজস্ব হইয়া থাকিত, সে গেল কোথায়?

পুত্রবধূর মধ্যে পুনর্জ্জন্ম নিতে সে কেন পারিল না, হায় ভগবান!

সুলতার চমক ভাঙ্গিল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া মনোরমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাদবের কাছে শেষ বিদায় নেওয়া হয় নাই। এ কান্নার ছোঁয়াচ মনে লাগাইতে সুলতা সাহস পাইল না। একপা একপা করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাদব বলিলেন, 'কাল থেকে দুর্ভাবনা সুরু হবে ছোটবৌ।'

'আমি চলে যাব বলে?'

যাদব বিচলিত ভাবে বলিলেন, 'আমার বাড়ী যদি তোমার বাড়ী হ'ত! তিন কাল অশান্তিতে কাটল, শেষের এই মহাকালটাও কি আমার তেমনি অশান্তিতে কাটবে? জীবনে একবার জট পাকালে আর ইতি নেই, ক্ষমা নেই।'

শেষবেলায় আজ জোর বাতাস উঠিয়াছে। যাদবের দাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, একটা ক্যালেণ্ডার পাখীর পাখার মত দেওয়ালে ঝাপ্টা মারে। সুলতার চোখ মিটমিট করিতে থাকে। যাদবের কোলে ন্যাকড়া জড়ানো যে ঝাপ্সা শিশুটি হাত পা নাড়িয়া খেলা করে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সুলতা ভাল করিয়া তাকাইতে পারে না।

যাদব আবার বলিলেন, 'বাপের বাড়ী যেতে তোমার খুব ইচ্ছা করে ছোট বৌ?'

'খুব! একটুও করেনা।'

বাপ নাই, বাপের বাড়ী যাওযার ইচ্ছা তার হইবে কেন? না গিয়া উপায নাই তাই যাওয়া। সরমা আর তাহাকে এখানে রাখিবেন না। এ সময়ে এ বয়সে নাকি স্বামীর কাছে থাকিতে নাই।

'তবে তোমায় একটা জিনিস দেখাই বাছা।'—বলিয়া পকেট হইতে যাদব ছোট একটি ফটো বাহির করিয়া সুলতার হাতে দিলেন।

এখানে ওখানে পোকায কাটিয়া দিয়াছে, লম্বালম্বি পাশাপাশি অজস্র আঁচড় পড়িয়াছে, কিন্তু এ যে একটি তরুণী বধূর ফটো তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সুলতা ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সাড়ে তিন হাত মানুষকে তিন ইঞ্চি করিয়া ফেলা হইয়াছে, ম্লান আলোছায়ার সামঞ্জস্যেই রক্তমাংসের পরিচয়, তবু সুলতার দৃষ্টি ভারি হইযা উঠিল, এলোমেলো নিশ্বাস পড়িল।

'আমার প্রথম স্ত্রীর ছবি ছোট বৌ। মরবার কয়েক মাস আগে নিজেই তুলেছিলাম। ভাল ওঠেনি।'

'আপনার দু' বিয়ে।'

যাদব হাসিলেন।

'মনোর মা জানেন?'

'জানেন বৈকি! খুব ভাল করেই জানেন।'

সুলতা বুকের মধ্যে কেমন ভার বোধ করিতেছিল। চাপা গলায় সে বলিল 'খুব ভাল করে জানেন কেন?'

'হাঁ। শান্তি বেঁচে থাকলে আজ মনোর মার চেয়ে বুড়ো হ'য়ে যেত, কিন্তু মরে গিয়ে সে আমার মনে নতুন, বৌ হয়েই বেঁচে আছে। একি মনোর-মা টের পায় না বাছা! এই সে দিন আমায় কবিত্ব করে

বলছিল, মরে যাওয়ার পর মানুষের বয়স আর বাড়ে না এ বড় আশ্চর্য্য গো, এ বড় অন্যায়।'

সুলতা সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, 'কবিত্ব করে নয়।'

'না। তাহলে নিজের কথায় নিজেই ও আঁতকে উঠত। তেইশ বছরের অভিজ্ঞতা।'

যাদব খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। সুলতার মনে হইল, কাঁচা-পাকা গোঁপদাড়ির আড়ালে ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাহার মাথার মধ্যে দপ দপ করিতে লাগিল। পাশে গিয়া বসা যায় না? দাঁড়ি ফাঁক করিয়া দেখা যায় না ঠোঁট দু'টি কাঁপিতেছে কি না? প্রাচীন যন্ত্রে আত্মার বাণী এমন ক্ষীণ মুমূর্ষু কেন ভাবিয়া সুলতার কান্না আসিবার উপক্রম হইল।

যাদব বলিলেন 'মনোর মার সংসারের বাইরে আমার স্থান ছোট-বৌ। শাস্তির সঙ্গে সুখ দুঃখের সম্পর্ক যেখানে শেষ হয়েছিল সেইখানে। মনোর মা আমার নাগাল পায়না। আমি তেইশ বছর পিছিয়ে পড়েছি। ওর কি সহজ দুঃখ জীবনে!'

সুলতা তাহা জানে। মাসের পর মাস কাটিয়া যায়, দিনে যে কতবার এ বাড়ীতে আসে ঠিক নাই, কিন্তু মনোর মার দেখা মেলে কদাচিৎ। নিজের সংসারের কোনখানে যে তিনি নিজেকে গোপন করিয়া রাখেন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

একশ আট রুদ্রাক্ষের মালা নিয়া তিনি কেবল জপই করেন সারাদিন —একান্তে।

একশ সাতটি রুদ্রাক্ষের পর প্রথমটি আবার ফিরিয়া আসে, গ্রহে গ্রহে পা দিয়া সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়া আসিয়া তিনি বোধ হয় বিশ্বদেবতাকেই প্রণাম

করেন। সহজ বিশ্বদেবতা নন্, সেই আদিম প্রেমিক, পৃথিবী যখন মাটির ঢেলা, মানুষ যখন খেলার পুতুল, তখন যে সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষকেই একমাত্র ভালবাসিতে পারা যায়।

সুলতার মুখের বিবর্ণতা নিরীক্ষণ করিয়া যাদব বলিলেন, 'বিদায় নিতে এসেছিলে সে কথা তোমার বোধ হয় স্মরণ নেই ছোট বৌ।' নির্বোধের মত মুখ করিয়া সুলতা বলিল, 'না সত্যি ভুলে গিয়াছিলাম।' 'কিন্তু বেলা আর নেই। শাশুড়ী হয়ত ওদিকে রাগ করবেন।'

সুলতা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। দরজার কাছে পৌছিলে পিছন হইতে যাদব বলিলেন, 'সাবধানে থেকো ছোট বৌ, শরীরের যত্ন নিও।'

বলিয়া ঘন ঘন দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

বারান্দায় পা দিয়া সুলতা দেখিতে পাইল রুদ্রাক্ষের মালা হাতে মনোর মা চিত্রার্পিতের ন্যায় এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ঈষৎ স্থূল দেহে গরদের সজ্জা, চওড়া করিয়া সিঁদুর পরিতে পরিতে সীঁথি রক্তাক্ত টাকের মত প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুলতা তাহাকে প্রণাম করিল।

আঙুলের ডগায় তাহার চিবুকের স্পর্শ আনিয়া চুম্বন করিয়া মনোর মা বলিলেন, 'ব্যাটা কোলে ভালয় ভালয় ফিরে এস মা।'

সকলে ভিড় করিয়া বিদায় দেয়।

পঙ্কু মড়ার মত হাসে, সুচিত্রা সকলের পিছনে আড়াল খুঁজিয়া নেয়। সরমার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশের চোখে পলক পড়ে না। সুমিত্রা

উদাসভাবে পথের গ্যাসের আলোটার দিকে চাহিয়া থাকে। হেমন্ত সকলের অগোচরে কি একটা ইসারা করে, লজ্জার ভান করিয়া সুলতা মুখ ফিরাইয়া নেয়। ওঠা নামার সময় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যাদব সুলতার দাদাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। গাড়ীতে বসিয়া সুলতা অনুপস্থিত মনোরমা ও তাহার মার কথা ভাবে।

গুপ্তধন

বর্ষাকালে তো বটেই, বছরের অন্যসময়েও কুন্তী নদীর মেজাজ কুন্তী বরফের প্রধান গুণবাচক শব্দটার ঠিক বিপরীত বিশেষণের অধিকারী। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একটা শাখা নদী মজিয়া যাওয়ার পর একা একা সমস্ত জলস্রোতকে বহিতে হওয়ায় নদীটা এরকম গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছিল। হরিখালি এবং তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রামও বড় নীচু। তাই, মাইল পাঁচেক লম্বা, সহরের সদর রাস্তার মত চওড়া এবং একতলা বাড়ীর সমান উঁচু একটা বাঁধ দিয়া এখানে কুন্তী নদীকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। বর্ষাকালে বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে বিস্ময় জাগে। এদিকে ভরানদীর ছোট-বড় ঢেউ বাঁধের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে, এদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো পড়িয়া আছে গ্রামের গাছপালা বাড়ীঘর, মাঝখানে দুদিকে দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড একটা মেটে সাপের মত আঁকা বাঁকা নদীর বাঁধ। পূর্ণিমা অমাবস্যায় নদীতে সমুদ্রের জোয়ার আসিবার দৃশ্যটি সবচেয়ে অপরূপ। হাত তিনেক উঁচু ফেনিল জলস্রোতকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে চোখে পলক ফেলা যায় না, প্রকৃতির প্রতি মনে সভয় শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটে।

ভীমের চোখে কিন্তু দৃশ্যটি দেখিয়া পলক পড়িত বেশী বেশী, দু'চোখ তার মিটমিট করিত এবং মনে মনে সভয় শ্রদ্ধার বদলে দেখা দিত একটা হাল্কা ছেলে মানুষী আনন্দ।

এই রকম খাপছাড়া লোক ছিল হরিখালি-বাসী ভীম।

বেঁটে শীর্ণকায় অকালবৃদ্ধ গোবেচারী ভীমের সঙ্গে গ্রামের কারো যেন বনিবনা হইত না, সকলেই অল্পবিস্তর ভয় করিয়া চলিত তাকে। মানুষকে ঠকাইতে সে ছিল ওস্তাদ। মানুষকে ঠকানো অবশ্য তার ব্যবসা ছিল না, জীবিকা সে অর্জ্জন করিত ন্যায়সঙ্গত ভদ্র উপায়ে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মানুষের মনে অসংখ্য ভুল ধারণার জন্ম দেওয়া, তার কাছে কেউ কিছু লাভের আশা করিলে তাকে হতাশ করা, কেউ ঠকাইতে আসিলে তাকে একেবারে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়া প্রভৃতি কতকগুলি ভারি বিশ্রী স্বভাব ভীমের ছিল। তার চেহারা দেখিয়া কে কল্পনা করিতে পারিত, লাঠিখেলার কৌশলগুলি সে এত ভাল আয়ত্ত করিয়াছে যে মাথায় আসল লাঠিয়ালের মত বাবরি চুল রাখিবার অধিকার তার ছিল। গরু ছাগলের দুধ বেচিয়া ভীম কোথায় এত টাকা পাইত যাতে গোয়ালাপাড়ার অনেক খানি তফাতে কিছু ফাঁকা জমির মধ্যে এগারটি পলাশগাছের আড়ালে সুন্দর একটি গৃহে প্রায় ভদ্রলোকের মতই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে পারিত, তাও গ্রামের লোক ভাবিয়া পাইত না। ছোট লোকের মত সে অজস্র সুখ উপভোগ করিলে কারো কিছু ভাবিবার ছিলনা, কিন্তু ভদ্রলোকের মত সুখ পাইতে তো পয়সা লাগে। সেটা আকাশ হইতে আসে না। তারপর ভীমের ব্যবহার। ছোট্ট মেনি বাঁদরের মত তার মুখ খিঁচানোর স্বভাবের জন্য সকলের গা জ্বালা করিত। সকলের সঙ্গে ভীম যে সব সময় হাল্কা হাসি-তামাসা আর ছেলেমানুষী কৌতুক করিয়া চোখ মিট মিট করিতে করিতে ফিক ফিক করিয়া হাসিত সেটাকে সকলে মনে করিত নিছক বাঁদরামি। ঘরে ঘরে এত অভাব অভিযোগ, লোকের মনে এত দুঃখ কষ্ট আর সে কিনা এরকম ইয়ার্কি ফাজলামি করিয়া দিন কাটাইবে! নিজের ঘরে সে যা খুসী

করুক, লোকের সঙ্গে তামাসা করা কেন? তাও অমন সব কৌশলময় মজাদার তামাসা!

মেজকর্ত্তার মাথা ফাটানোর তামাসার মধ্যে কিন্তু কিছু কৌশল থাকিলেও মজা বেশী ছিল না। ভীম যে কেন মেজকর্ত্তার মাথা ফাটাইয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে মেজকর্ত্তার হুকুমে ভীমের ছ'টা গরুকে সাতবার খোঁয়াড়ে দেওয়া হইযাছিল বলিযা, কেউ বলে ভীমের বড় মেয়ে, তিনপুকুরের কেষ্টর সঙ্গে যার বিবাহ হওযায় গাঁ শুদ্ধ লোক চটিয়া গিযাছে, মেজকর্ত্তা তার মানহানি করিযাছিলেন বলিযা। শেষেরটাই সম্ভবতঃ সত্য, কারণ ভীমের বড় মেযে আসিতে না বলিলে রাতদুপুরে মেজকর্ত্তা তার বাড়ীর পিছনে পলাশগাছের কুঞ্জবনে অভিসারে আসিয়া তাকে যে মাথা ফাটানোব সঙ্গত কারণ ও সুযোগ সরবরাহ করিতেন তা সম্ভব মনে হয় না। তা ছাড়া, নিজের মাথাটা কেউ ফাটাইয়া দিলে সে বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে চুপচাপ থাকার মত মানুষও মেজকর্ত্তা নন।

তবে মেজকর্ত্তার যে মাথাটা ভীম ফাটাইয়া দিযাছিল সেটাতে যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকিলেও তার টাকা ছিল অনেক এবং মানুষের আনুগত্য গ্রামের জমিদারেরই থাকে বেশী। তাই একদিন রাত্রে বাবুদের বাড়ী মস্ত একটা ডাকাতি হইয়া যাওয়ার পর ভীমকে আট বছরের জন্য জেলে যাইতে হইয়াছিল। ডাকাতির কথাটা মিথ্যা নয়। একজন খুন, তিনজন ভয়ানক জখম আর নগদে গযনায় প্রায় তেইশ হাজার টাকা লুট,—এ ব্যাপারগুলি সত্য সত্যই ঘটিয়াছিল। ভীম যে নিজে ডাকাতি করিতে যায় নাই এটা গ্রামের অনেকে বিশ্বাস করিত, এখনো করে। তবে ডাকাতির সঙ্গে তার অন্যভাবে যোগ ছিল কিনা এ বিষয়ে কেউ নিঃসন্দেহ

নয়। ভীমের পক্ষে কিছু অসম্ভব হওয়া যে অসম্ভব—লোকে এখনো এ বিশ্বাস পোষণ করে। মেজকর্ত্তার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ভীমের শাস্তি কিন্তু অন্য ডাকাতের কয়েকজনের তুলনায় হইয়াছিল খুব কম। তারা কুড়ি বছরের জন্য দ্বীপান্তরে গেল, ভীম এবং আরও তিনজন ডাকাত মোটে আট বছরের জন্য বাস করিতে গেল দেশেরই নানা জেলে। আট বছরের মধ্যে আবার পুরা একটা বছর মাপ করিয়া সাত বছর পরেই তারা ভীমকে দিল ছাড়িয়া।

ভাদ্রমাসের এক দুপুর বেলা ভীম ফিরিয়া আসিল গ্রামে। ভীমকে দেখিয়া গ্রামের লোক যেমন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, নিজের বাড়ী ও বাড়ীর পিছনের এগারটি পলাশ গাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীম তার চেয়ে কম আশ্চর্য্য হইল না। স্থানটিতে সৃষ্টি হইয়াছে একটি সমতল মাঠের, বাঁশের তৈরী দু'জোড়া গোলপোষ্ট দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় এখানে এখন ফুটবল খেলা হয়।

চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছিল ভাদ্রমাসের রোদ। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কাছের একটা পুকুরে যাওয়ায় হাঁদার সঙ্গে ভীমের দেখা হইয়া গেল। হাঁদা তার ভাইপো, কুড়ি বাইশ বছর বয়স, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল: অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া একটি মেয়ের বাপ হওয়ার পর হইতে বয়স্ক লোকের মত গম্ভীর ভারিক্কি চালে চলিতে এবং মাছ ধরিতে ভালবাসে। পুকুরের ঘাট জুড়িয়া মস্ত একটা আমগাছের ছায়া পড়িয়াছিল, পুকুরে ছিপ ফেলিয়া হাঁদা সেই ছায়ায় বসিয়া টানিতেছিল বিড়ি। সাত বছর দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও পরস্পরকে তারা তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। জেলে সাত বছর ভীমের চুল আধ ইঞ্চির বেশী বাড়িতে

পায় নাই। হাঁদার তুলনায় নিজের প্রায় ন্যাড়া মাথাটায় সলজ্জ ভাবে হাত বুলাইয়া ভীম বলিল, 'কিরে হাঁদা!'

হাঁদা ভারিক্কি চাল চালিতে ভুলিয়া গিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, 'কাকা! কবে ছাড়ান পেলে কাকা?'

ভীম বলিল, 'পরশু তরশু হবে কে জানে! তুই তো মস্ত হয়ে গেছিস হাঁদা, গোঁপ গজিয়েছে তোর!'

অজানাকে জানিবার ভয়ে আপনজনেদের সম্বন্ধে হাঁদাকে হঠাৎ সে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, হাদার গোঁপ গজানোর জন্য প্রথমটা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া সে একটু শান্তি বোধ করিল। হাঁদার সমবয়সী একটি ছেলে সে রাখিয়া গিয়াছিল, কে জানে সেও এরকম ঝাঁকড়া চুল রাখিয়াছে কিনা, তারও এরকম গজাইয়াছে কিনা গোঁপ!

তবে এতকাল পরে গ্রামে ফিরিয়া আত্মীয় পরিজনের সংবাদ জানিবার কৌতূহল শুধু কাল্পনিক ভয়ে বেশীক্ষণ ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। প্রথমে ছেলেটার কথাই ভীম জিজ্ঞাসা করিল। না হাঁদার মত সে গোঁপ গজানোর সুযোগ পায় নাই, ভীম জেলে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। মনটা ভীমের যেন মোচড় খাইয়া গেল। কিছু দুঃসংবাদ শুনিতে হইবে এ আশঙ্কা ভীমের ছিল। তবে প্রথমেই এ ধরণের সংবাদ সে প্রত্যাশা করে নাই। হৃদয়টা পুত্রশোকে গোঁয়ার হইয়া যাওয়ায় বাকী দুঃসংবাদগুলি শুনিবার আতঙ্ক কিন্তু আর তার রহিল না।

একে একে হাঁদা সব সংবাদই দিল। ভীমের বৌ আর ছোট ছেলে মেয়ে দুটি বাঁচিয়াই আছে, তবে ওদের মধ্যে প্রথম দুজন যে বর্তমানে কোথায় আছে হাঁদা ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। অবশ্য দু'জায়গায়

যে ওরা আছে তাতে হাঁদার কোন সন্দেহ নাই। হয় তিনপুকুরে বড় জামাই কেষ্টর কাছে, নয় কালীতলায় ছোট জামাই নবীনের কাছে। হাঁা, কালীতলার বুড়া নবীনের সঙ্গেই ভীমের ছোট মেয়ে রাণীর বিবাহ হইয়াছে।

ভীম জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বিয়ে দিল কে?'

হাঁদা হাঁদার মত বলিল, 'বাবা। বাবুরা চালা কেটে তুলে দেওয়ায় খুড়ীমা তখন আমাদের বাড়ীতে ছিল কিনা—'

'নবীন তোর বাপকে কত টাকা পণ দিয়েছিল রে?'

'তা জানি না কাকা।'

'তোরা থাকতে তোর খুড়ী জামাইবাড়ী গিয়ে আছে কেন তাতো জানিস বাবা?'

ভীমের গলার আওয়াজে ঝাঁঝের খোঁজ পাওয়া যায় না, তবু যে তার কথাগুলি ঝাঁঝালো মনে হয়, সেটা সম্ভবতঃ চারিদিকের রোদের ঝাঁঝের জন্য। হাঁদার বয়স হইয়াছে, অন্যায়টা সে এখন বুঝিতে পারে। তবে বাপ-দাদার অন্যায় বলিয়া পুরাপুরি পারে না। গম্ভীর মুখে কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত করিয়া হাঁদা বলিল, 'গাঁ শুদ্ধু লোক শত্তুরতা জুড়ল কি না, তাই দুঃখ কষ্ট সইতে না পেরে—'

ভীম বলিল, 'দুঃখ কষ্ট হবার তো কথা ছিল না বাবা! গাঁ শুদ্ধু লোক শত্তুর হল হল, আপন জনও তো ছিল গাঁয়ে।'

একবার জবাব দিতে না পারিয়া হাঁদা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁকড়া চুলগুলি পিছনে হটাইয়া দিল।

তারপর ভীমকে হাঁদা তাদের বাড়ী নিয়া গেল। ক্ষুধায় ভীমের শরীর অস্থির করিতেছিল। শোক দুঃখ যদি বা সে কোন রকমে

সহিতে পারে ক্ষুধার জ্বালা একেবারেই পারে না। বুড়া নবীনের কাছে যে তার মেয়েকে বিসর্জ্জন দিয়াছে, বিপদের দিনে সে-তার স্ত্রী পুত্রের দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই, ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াই পেট ভরানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে যাওয়া ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হইত কি না ভগবান জানেন। হাঁদা দই-চিড়ার ফলারের ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তাহা ভক্ষণ করিল। মান অভিমান ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেন মনের অন্য মনোভাবের রাহাজানির অপরাধে মনের অনানুষিকতার জেলখানায় বাস করিতে গিয়াছে। এ বাড়ীতে বিশ্রাম করিতেও সে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর কর্ত্তা ফিরিয়া জেলফেরত একটা ডাকাতকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনার জন্য হাঁদাকে এমন গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল যে, চাঁচের বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া কথাগুলি খানিকক্ষণ শুনিবার পর ভীম আস্তে আস্তে এক পা এক পা করিয়া নামিয়া গেল পথে।

পথে চলিতে চলিতে নানা লোকের সঙ্গে দেখা হইতে লাগিল। কেহ কথা বলিল, কেহ বলিল না; যে বলিল তার কথাগুলিও যে মিষ্টি শোনাইল তা বলা চলেনা। এমনিই ভীমকে একদিন যারা পছন্দ করিত না, আজ জেলের ছাপ-মারা সেই ভীমকে তারা খাতির করিবে এরকম প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ভীমের মুখ দেখিয়া মনে হইল না অন্যায়টা সে করিয়াছে। এতসব বড় বড় আশা আকাঙ্ক্ষা তার সাত বছরে লোপ পাইয়া গিয়াছে যে হরিখালি-বাসী কোন গৃহস্থের খাতির ও সমাদর পাওয়ার মত তুচ্ছ প্রত্যাশাকে মনে পোষণ করিবার ধৈর্য্যও হয়ত তার ছিল না। হাঁটিতে হাঁটিতে ভীম গ্রামের প্রান্তভাগে গোস্বামীদের আমবাগানের একপাশে বাগ্দী পাড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে, রোদের আর সে রকম তেজ নাই। বাগ্দীপাড়ার সমস্ত স্ত্রী পুরুষেরাই বোধ হয় একটা খোলা চালার তলে জমা হইয়া হৈ চৈ করিতেছিল ; ঠিক চালার তলে নয়, যত লোক একত্র হইয়াছে তার সিকি অংশেরও বোধহয় চালার নীচে গোবর-লেপা নীচু ভিটাটুকুতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। কোন একটা উৎসবের জের চলিতেছে তফাতে দাঁড়াইয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিবাহাদি কিছু ঘটিয়া থাকিবে। তাড়ি গেলা যে কবে, অথবা আজ হইতে কখন আরম্ভ হইয়াছিল অনুমান করা অসম্ভব, তবে ইতিমধ্যেই ফলাফলটা ভাল-ভাবেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিযাছে। এখানে ওখানে নোংরা অকথ্যভাষায় সুরু হইয়াছে ঝগড়া, দু'একজন চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, দু'একটি স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো চলে না। খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ভীম অনেকক্ষণ খাপছাড়া দৃশ্যটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই অস্পৃশ্য ছোটজাতের পাড়ায় সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে আসিয়া পড়ে নাই, এখানে একদিন তার একটি আকর্ষণ ছিল, নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। আকর্ষণটির কুটীরে আসিয়া বসিবার অধিকার পাওয়ার জন্য একদিন অবিকল এইরকম একটি উৎসবের খরচাও দিতে হইয়াছিল তাকে। জীবনে প্রথম সেদিন সে চাখিয়া দেখিয়াছিল তাড়ি! কত খাপছাড়া সখই যে তখন ছিল ভীমের। এগারটী পলাশ গাছের আশ্রয়-স্থিত তার ভদ্র ও নীতি-সঙ্গত জীবনযাপনের গৃহটীর মত এখানকার অবৈধ জীবন যাপনের সেই কুটিরটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীমের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। এ আঘাতটা যেন তার হৃদয়ের ব্যথা বোধ করা অংশটুকুর সবচেয়ে দুর্ব্বল দিকটাতে ঘা দিয়াছে— যেখানে ঘা লাগিলে অনায়াসে একটুখানি কান্না আসে। কুকী নাম

ছিল সেই লম্বা ছিপ ছিপে কালো ও নোংরা বাগ্দী মেয়েটার এবং তার জন্ম ভীমের এত বেশী স্নেহ ছিল যে জেলে তার সাত বছরের নারী-সংক্রান্ত কল্পনাগুলির জন্ম কদাচিত্ দ্বিতীয় একটী কেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিতেছিল। কাছে আসিলে ভীম তাকে চিনিতে পারিল। হরিথালির প্রসিদ্ধ চোর মধু। সাতবছরের মধু নিজের ছ্যাঁচড়া চোরের উপযুক্ত রোগা চেহারাটা বদলাইয়া সেকেলে ডাকাতের মত ভীষণ যোয়ান হইয়া না উঠিলে কাছে আসিবার আগেই ভীম তাকে চিনিতে পারিত।

চিনিতে পারিয়া মধু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল 'পেরণাম, বাবুমশায়। লটা পযসা দিবান্?'

বাগ্দীপাড়ার লোকেরা সাধারণতঃ বাবুমশায় বলে না, বলে কর্ত্তা। কুকী কিজন্ম তাকে বাবুমশায় বলিত বলা যায় না। সম্বোধনটা তারপর পাড়ার সকলের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছিল। ভীম বলিল 'দেবরে মধু, নিশ্চয় দেব। এখন তো সঙ্গে পয়সা নেই, রাত্তির বেলা ফের যখন আসব তখন দেব। কুকী কোথায় আছে জানিস মধু?'

মধু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চালার তলে ভিড়ের দিকে একটা হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিল; 'উই হোথায়।'—তারপর সেই হাতটাই নিজের বুকে ঠুকিয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে যোগ দিল, 'কুকী এখন মোর বাবুমশায়, বেন্দাকে পুলিশে লিয়ে গেছে।'

বলিতে বলিতে মধুর মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া সে বলিল, 'কুকীর খপর লিচ্ছ যে? ওসব মতলব কোরোনি বাবুমশায়, আমি লিয়েছি কুকীকে বেন্দাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে, কুকীর দিকে যদি নজর দিবেত—'

ভীম শান্তভাবে, বলিল, 'তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি মধু? কাল নয়তো পরশু আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না। কুকীর জন্ম আমার কিসের মাথাব্যথা রে, অ্যাঁ? একটা কাজে এসেছি গাঁয়ে, কাজটা হলেই বাস্ আর একদণ্ড গাঁয়ে রইব না। আর শোন বলি মধু, কাজটা যদি হয় তোদের সবাইকার লাভ হবে, অনেক টাকা পাবি তোরা।'

'কি কাজ বাবু মশায়?'

'রাত্তিরে এসে বলব মধু, এখন নয়। সবাইকে বেশী তাড়ি গিলতে বারণ করিস, তুই নিজেও গিলিস্ না আর। এক একজন দশ কুড়ি বার কুড়ি টাকা পাবি, কিন্তু আমার কথা না শুনলে সব ফস্কে যাবে তা বলে রাখছি বাপু। কাল যত পারিস, আজ রাতে নয়।'

'দশ কুড়ি বার কুড়ি টাকা দিবে! কি কাজ বলে যাও বাবু—এই বাবু মশায়, শুনে যাও, পায় ধরি তোমার—'

গ্রামের আধা ভদ্র আধা অভদ্র গৃহস্থ ভীমের জন্ম বাগ্দী পাড়ার সকলে যেমন ভয় ও শ্রদ্ধা পোষণ করিত, অতিরিক্ত মেলামেশার জন্ম নিজেদের মধ্যে তেমনি সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করিত! প্রয়োজনের সময় তাকে মানিয়া চলিত সকলেই, আবার আড্ডা দেওয়ার সময় প্রায় সাঙ্গাতের মতই সকলের মধ্যে সে মিশিয়া যাইত। গ্রামের কারো জন্ম ভীমের এতটুকু মাথা ব্যথা ছিল না, কিন্তু বিপদে আপদে এই অস্পৃশ্য ছোটলোকগুলির সে অনেক উপকার করিয়াছে—বোধ হয় কুকীর জন্ম। যে কোন ব্যাপারেই হোক, তার কূট-বুদ্ধির সাহায্য পাইলে বাগ্দীপাড়ার সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে চিরদিন।

সাতবছরে স্মৃতি হয়ত মধুর ঝাপ্সা হইয়া আসিয়াছিল, তবু একেবারে ভুলিয়া যাওয়ার মত মানুষ ভীম নয়। ভীমের মুখে টাকার কথা শুনিয়া

মধুর চমক লাগিয়া গেল, ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সে মুখে মুখেই কতবার যে পায়ে ধরিল ভীমের তার সীমা নাই।

ভীম কিন্তু শুধু বলিল, 'রাতে ঘুরে এসে বলব মধু, সবাই থাকিস এখানে। তাড়ি খাস না আর।'

তাড়ির নেশায় আধা বিভ্রান্ত মধু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, ভীম সরু পথটি ধরিয়া জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। এক এক ধরণের পাগলামি থাকে মানুষের সোজা কথায় লোকে যাকে বলে ছিট আর শুদ্ধ ভাষায় বলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য,—যা স্থায়ী কিন্তু অস্থায়ী নেশার চেয়ে জোরালো। পথ চলিতে চলিতে আপন মনে ভীমের মেনি বাঁদরের মত মুখ খিঁচানো দেখিলে, একদিন তার বাঁদরামিতে গাঁয়ের যত লোক বিরক্ত হইত তারা সকলে আজ অবাক্ হইয়া যাইত। ভীমের খাপছাড়া মনটাতে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল। মানুষটা আসলে সে ছিল খুব সরল, কেবল জীবনটাকে সে জিলাপির চেয়েও বাঁকা বলিয়া জানিত বলিয়া হরদম ওরকম বাঁকা ব্যবহার করিত, খাপছাড়া স্বভাবের পরিচয় দিয়া গাঁশুদ্ধ লোককে বিরক্ত করিয়া তুলিত। জেলে সে জীবনের আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্যাঁচের সন্ধান পাইয়াছে। ফলে আরও গভীরতর ও সম্পূর্ণতার বিকাশ হইয়াছে তার প্রকৃতির। এখন সে একা একা নিজের মনে, দর্শক না থাকিলেও, অতুলনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে মুখ ভেংচাইতে পারে।

গ্রামের কয়েকটি মাত্র পাকা বাড়ীর মধ্যে বাবুদের বাড়ীটিই প্রকাণ্ড,—তিন তিনটা মহাল আছে বাড়ীটার। মুখভ্যাংচানোর সাধ মিটিয়া গেলে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে নদীর ধারে বাঁধটার উপর কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে

পাক খাইয়া সূর্য্যাস্তের সময় ভীম বাবুদের বাড়ীর সদর মহলের সামনে বাগানটীতে প্রবেশ করিল। বাগানে একটী কাটালিচাঁপার গাছের তলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মেজকর্ত্তা আরাম করিতেছিলেন। কয়েকটি লুকানো কাটালি চাঁপা সবে ফুটিবার উপক্রম করিয়াছে, তবু স্থানটীতে গাঢ় মোহকরী গন্ধ এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে একবার নিশ্বাস টানিয়াই আবেগে ভীমের যেন আবার একটুখানি কান্না আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মধু তাকে যে ভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিল মেজকর্ত্তাকে তেমনিভাবে প্রণাম জানাইয়া এ ভাবটা ভীম সামলাইযা নিল অতিকষ্টে।

মেজকর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, 'কে? ভীম? কি চাস্ তুই?'

ভীম জোড়হাতে বলিল, 'বাবু, একটা নিবেদন জানাতে এসেছি, একটা ভিক্ষা চাই বাবু আপনার ঠেঁয়ে। যা হবার তাতো হল, এবার গরীবকে মাপ করে দিন। আমি হলাম গিয়ে আপনার ছিচরণের দাস, আপনি বিরাগ হলে কি আমার রেহাই আছে বাবু? একটা উপায় করে দিন কত্তা যাতে গাঁয়ে একটা ঘরটর বেঁধে—'

মেজকর্ত্তা সিধা হইয়া বসিয়া বলিলেন, 'তোর তো স্পর্দ্ধা কম নয় ভীম! তুই আমার কাছে এসেছিস্ এসব কথা বল্‌তে!'

ভীম কাতর কণ্ঠে বলিল, 'আমি বাবুর চাকর।'

মেজকর্ত্তা তখন একটা হাঁক দিলেন। দুজন চাকর আসিয়া দাঁড়াইতে মেজকর্ত্তা বলিলেন, 'এ হারামজাদাকে ঘাড় ধরে বের ক'রে দে' ত। ব্যাটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছে।—কাল যদি তোকে গ্রামে দেখতে পাই ভীম, জুতো মার্‌তে মার্‌তে গ্রাম থেকে দূর করে দেব। পাজী, ডাকাত, হারামজাদা!'

ভীম চলিয়া গেলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মাথায় চুলের নীচে লুকানো একটা ফাটার উঁচু চিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে মেজকর্ত্তা লুকানো কাটালি-চাঁপা ফুলগুলির গাঢ় গন্ধ মেশানো বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যে তিনি কেন ফেলিলেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

আজ তিথি ছিল দশমী। ভীম যখন বাগ্দী-পাড়ায় ফিরিয়া আসিল তখন চাঁদ উঠিয়াছে কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘের জন্ম ভাল করিয়া জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া তখনো সকলে চালার নীচে উৎসব করিতেছিল। শুধু যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের দিকে অপরাহ্নবেলায় তাকানো চলিত না, তারা চলিয়া গিয়াছে। ভীম আশা করিতে-ছিল কুকীকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু মধু সম্ভবতঃ তাকেও সরাইয়া দিয়াছে।

মধুকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেও তাড়ি গিলিয়া দু'চারজনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভীম মনে মনে আপশোষ করিতে লাগিল। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে পাড়ার বুড়া মোড়ল বিষ্টুও নেশায় চিৎ হইয়া চোখ বুজিয়াছে। বিষ্টুর সম্বন্ধেই ভীমের একটু ভাবনা ছিল,—লোকটা বড় চালাক বিষ্টু, বড় খুঁতখুঁতে তার প্রকৃতি। যে কথা আজ সে সকলকে বলিবে, যে কাজ সকলকে দিয়া করাইয়া নিবে, বুড়া তার মধ্যে হয়তো ভয় ভাবনার অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়া সকলকে দমাইয়া দিত। নেশায় যারা কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের বাদ দিয়া জোয়ান লোকগুলিকে গুনিয়া দেখিতে পাইল সর্ব্বসমেত সাতাশজন আছে। দু'চারজন সবলদেহা স্ত্রীলোকও পাওয়া যাইতে পারে। বাগ্দী মেয়েরা পুরুষের কাজ করিতে অপটু নয়।

একটা চাটাই পাতিয়া ভীমকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। দশকুড়ি বারো কুড়ি টাকার ইঙ্গিতটা মধু বোধ হয় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল, ঔৎসুক্য, সন্দেহ ও আশায় বিচলিত গরীব ছোটলোক নারীপুরুষগুলি ভীমের চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল।

ভীম বলিল, 'কেউ গোলমাল করবে না' যা বলব শুনবে নয় তো সব ফস্কে যাবে কিন্তু, গাঁয়ের লোক টের পেলে বিপদ হবে। সবাই চুপ, টু শব্দটি নয়—বাবুদের বাড়ী ডাকাতি করার জন্য সাত বছর জেলে ছিলাম জানিস তো সবাই? বেশ এখন কথা হল, গাঁয়ে আবার আমি ফিরে এলাম কি জন্য? আমার ঘর বাড়ী গেছে, জমিজমা গরু বাছুর গেছে, ছেলে বৌ কেউ গাঁয়ে নেই, গাঁ শুদ্ধ লোক পিছনে লেগেছে,—গাঁয়ে আমি ফুরতি করতে আসিনি বাবু হাঁ!'

মধু বলিতে গেল, 'বাবুমশায়—'

ভীম বলিল, 'তুই থাম মধু। যত গয়না টাকা লুট করেছিলাম আমরা, সব গাঁয়ের এক জাগায় পুঁতে রেখেছিলাম। সবাই তো ধরা পড়ে জেলে গেলাম, কে আর গয়না টাকাগুলো নিতে আসবে? সব এখনো সেথায় পোঁতা আছে। সবায়ের আগে আমি ছাড়া পেলাম। আজ রাত্রিরে সব খুঁড়ে নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু কি মুস্কিল হয়েছে জানিস মধু, সবাই মিলে মস্ত গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিলাম। আমি দুব্বোল মানুষ, একলা খুঁড়ে বার করতে পারব না। আর কি জানিস্, ঠিক যেখানে সব পোঁতা হয়েছিল, একটা চিহ্ন ছিল সেখানে, সে চিহ্নটা হারিয়ে গিয়েছে।"

মধু ব্যাকুল ভাবে বলিল, "তবে? তবে কি হবে বাবু মশায়?"

ভীম শান্তভাবে বলিল, 'কি আবার হবে? চিহ্ন না থাক, জায়গাটা

তো চিনি। খানিকটা জায়গা বেশী খুঁড়তে হবে, এই মাত্তর। নয় তো তোদের ডাকব কেনরে? তোদের এতগুণো মানুষকে দশকুড়ি করে টাকা দিতে আমার কতগুণো টাকা যাবে বলত? সাধ করে কেউ তা দেয়? কিন্তু কি করব, আজ রাত্তিরে খুঁড়ে তোলা চাই সব, কাল আরও তিন জনে ছাড়া পাবে।'

বিপিন নামে একজন বলিল, 'দশ কুড়ি নয় বাবু মশায়, বারো কুড়ি বলেছ।'

ভীম বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা তাই দেব—বারো কুড়িই দেব। আগে খুঁড়েই বার করতো বাক্সটা। সব যদি পাইরে আমি, তোদের বারো কুড়ি করে টাকা দিতে মরব না। কোদাল ফোদাল যা আছে যার ঘরে সব খুঁজে পেতে নিয়ে আয় সবাই, একটু রাত্তির হলে সেথায় নিয়ে যাব। কারো কাছে কথাটি ফাঁস কোরোনি কিন্তু বাবু কেউ, তা হলে সব্বোনাশ হবে।'

মধু কাছে আসিয়া ফিস ফিস করিয়া অনুযোগ করিল, 'এত লোককে কেন বললে বাবুমশায়? বেছে বেছে কজনকে বললে হ'ত।'

ভীম বলিল, 'অনেক লোক চাই মধু, দু'চারজনের কম্মো নয়। রাতারাতি কত খুঁড়তে হবে তুই কি বুঝবি।'

পুলিশের কথা তুলিয়া দু'একজন একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। ভীম তাদের অভয় দিয়া বলিল, 'কিসের পুলিশ? জেল খেটে আসিনি আমি ও গয়না টাকার জন্য? ওসব এখন আমার সম্পত্তি। কিছু ভয় নেই বাবু তোদের—বিপদ ঘটেতো আমার ঘটবে, তোদের কি?'

একে একে কোদাল খন্তা শাবল প্রভৃতি মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। একজন, নেশাটা তার একটু জোরালো

হইয়াছিল, ঘাড়ে করিয়া একটা লাঙ্গল পর্য্যন্ত নিয়া আসিল। টাকার পরিমাণের কথা ভাবিয়া সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সকলকে শান্ত করিয়া রাখিতেই ভীমের বেগ পাইতে হইল বেশী। ক্রমে ক্রমে সব চেয়ে সন্দেহপ্রবণ ভীরু লোকটিরও ভীমের উপর বিশ্বাস জন্মিতেছিল। টাকা ও গয়না পুঁতিয়া রাখার কথাটাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? ডাকাতি হইয়াছিল সত্য, গয়না ও টাকাগুলি কোন এক জাগায় ডাকাতেরা লুকাইয়া রাখিয়াছিল বৈকি,—সব ডাকাতেই তাই করে। তারপর ধরা পড়িয়া ডাকাতেরা যে জেলে গিয়াছিল, ভীম যে সাত বছর জেলে কাটাইয়া ছাড়া পাওয়া মাত্র গ্রামে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাও মিথ্যা নয়। সন্দেহ করার কি আছে তবে? আজ রাতারাতি সবাই তারা বড়লোক হইয়া যাইবে।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদটা আকাশের অনেকখানি উঁচুতে উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া দিল, তারপর মেঘ উঠিয়া নামিল বৃষ্টি। ভীম বলিল, 'চ' মধু, এবার আমরা যাই।'

'বিষ্টির মধ্যে?'

'তাইতো ভাল, কেউ দেখতে পাবে না যাবার সময়।'

কারো দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা বৃষ্টি না নামিলেও খুব বেশী ছিল না। গ্রামের প্রান্তে নদীর কাছাকাছি বাগ্দী পাড়া, সন্ধ্যার পরেই এ অঞ্চল নির্জ্জন হইয়া আসে। খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি কাঁধে করিয়া সাতাশ জন পুরুষ ও পাঁচটি মাঝ বয়সী স্ত্রীলোক কিছু পিছনে চলিতে লাগিল, আগে আগে নদীর দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে বৃষ্টিতে ভেজা সত্ত্বেও ভীমের মনটা খুসী হইয়া উঠিল। এর নাম সর্দ্দারি। এমনি ভাবে দল বাঁধিয়া এক একটা মানুষ সংসারে বড় বড় কাজ করে। সে কোথায় নিয়া

চলিয়াছে সকলকে এই বর্ষা বাদলের মধ্যে ? তার নিজের কাজের জন্য ! তার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল করার জন্য ! আত্মপ্রসাদের অন্যমনস্কতায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া হাঁটিতে গিয়া পিছল পথে ভীম একবার একটা আছাড় খাইল। তা হোক। জল মাটির সঙ্গে আজ তার পীরিতির সীমা নাই। বত্রিশজন মানুষ মিলিয়া আজ যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিবে, মুঠা ভরিয়া সে মাটি তুলিয়া নিজের মুখে মাখিতেও ভীমের আজ আপত্তি থাকিবে না।

নদীর ধারে বাঁধের উপর উঠিয়া ভীম বাঁধ ধরিয়াই সোজা দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। কিছু দূর আগাইয়া বাঁয়ে দেখা দিল ক্ষেত, তারপর ছোটখাট একটা জঙ্গল। আধা জঙ্গল আধা বাগান এটা, আম কাঁটাল পলাশ পিপুল বাবলা প্রভৃতি গাছগুলি বিশৃঙ্খলভাবে গজাইয়া উঠিয়া বাঁধের গা পর্য্যন্ত ঘেঁষিয়া আসিয়াছে, বড় বড় গাছের ফাঁকগুলিতে শুধু জঙ্গুলে-চারা ঠাসা। আরও খানিকটা আগাইয়া ভীম থামিয়া গেল। এখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশের মেঘ পাতলা হইয়া আসায় একটা অপার্থিব মৃদু সাদাটে আলোয় চারিদিক অস্পষ্টভাবে নজরে পড়িতেছে। সকলের আগে ভীম সাবধানে সঙ্গের নরনারীদের গুণিয়া দেখিল, তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলিল, 'একজন কমল কেন রে? কে পিছনে পড়ে রইল ?'

জবাব দিল মধু, বলিল, 'কুকী এসেনি বাবুমশায়, রাস্তায় পড়ে আছে।'

'কুকী আসছিল নাকি ? আমি দেখিনি তো!'

'দেখেছ বাবুমশায়, দেখেছ। খন্তা নিয়ে মোটামত মেয়েলোকটা আসছিল না, সে তো কুকী।'

মধু নাকি অনেক বারণ করিয়াছিল কিন্তু কুকী কথা শোনে নাই, প্রাণপণে তাড়ি গিলিয়াছিল। তারপর আসিতে আসিতে ধপাস্।

নাড়া দিয়া হুঁস নাই দেখিয়া রাস্তার ধারে গাছতলার দিকে ঠেলিয়া দিয়া মধু চলিয়া আসিয়াছে।

'বিষ্টিতে হুঁস্ হলে ঘরকে ফিরে যাবে বাবুমশায়।'

সেজন্য ভীম ভাবে না, সে শুধু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে কুকীকে সে চিনিতে পারিল না কেন? খন্তাধারিণী মোটা স্ত্রীলোকটির দিকে তো কতবার তার চোখ পড়িয়াছিল! চিনিতে পারিলে কুকীর সঙ্গে দু'চারটা কথা বলিত ভীম। কিন্তু কুকীও কেন তাকে চিনিতে পারে নাই? তার তো চিনিতে কোন বাধা ছিল না! মধুর ভয়ে কি কুকী তার সামনে আগাইয়া আসে নাই, তার সাত বছরের দুর্দ্দশার জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া একটু সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করে নাই, নিজে সে এতকাল কত কষ্ট পাইয়াছে সে কাহিনী বলিবার সাধ দমন করিয়াছে? মেজকর্তার সম্মুখ হইতে ভীম আনায়াসে বিষণ্নমুখে উঠিয়া আসিতে পারিয়াছিল, এখন কিন্তু মধুকে তার মুখ ভ্যাংচাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। অন্তরটা গভীরভাবে নাড়া খাইলে ভীমের মুখের চামড়াই সকলের আগে বিদ্রোহ করে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভীমের দলটির প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনা মাঝখানে একটু দমিয়া গিয়াছিল, এইখানেই আশে-পাশে কোথাও টাকাও গয়নাগুলি পোঁতা আছে বুঝিতে পারিয়া এবং তাড়ির নেশায় আজ সকলেরই বুঝিতে পারার প্রক্রিয়াটা একটু কমবেশী বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হইতে থাকায়, সকলে আবার মহোৎসাহে কলরব জুড়িয়া দিল।'

ভীম বলিল 'চুপ্, চুপ্! একদম চুপ সবাই।

সকলেই আজ ভীমের একান্ত বাধ্য ও অনুগত। মুহূর্ত্তে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁধের গা ঘেঁষিয়া, পরস্পরের প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে দুটি

পিপুল গাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। সেই গাছ দুটি দেখাইয়া দিয়া ভীম সকলকে বুঝাইয়া বলিল যে এই দুটি গাছের মাঝখানে বাঁধের কোন এক স্থানে তাদের প্রার্থিত গয়না ও টাকা পোঁতা আছে। ঠিক কোন-খানে পোঁতা আছে ভীম তা বলিতে পারিবে না, পুঁতিবার সময় তাড়া-তাড়ি ছোট একটা পাথর জায়গাটার উপরে চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিল, পাথরটা যে কোথায় গিয়াছে! কেউ হয়ত সরাইয়া নিয়া গিয়াছে। না, কেউ মাটী খুঁড়িয়া আগেই সব তুলিয়া নিয়া গিয়াছে কারো এ ভয় করার কারণ নাই। কে জানিত যে পাথরটার তলে বিশ বাইশ হাজার টাকার গুপ্তধন পোঁতা আছে? তাছাড়া আগে এখানটা খোঁড়া হইয়া থাকিলে তার চিহ্ন থাকিত, টাকাও গয়না অনেক নীচে পোঁতা আছে, অনেক ভিতরের দিকে। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া সকলে বাঁধের এদিকের ঢালুর মাঝামাঝি স্থানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিক, তারপর কোনদিকে কি ভাবে কত দূর পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া চলিতে হইবে, যথাসময়ে ভীম সে নির্দ্দেশ দিবে। প্রাণপণে খাটুক সকলে, সমস্ত আলস্য ভুলিয়া যত তাড়াতাড়ি পারে খুঁড়িয়া চলুক, কেননা, আজ রাত্রির মধ্যেই যেমন করিয়া হোক লোহার বাক্সটা তো আবিষ্কার করা চাই।

সৈন্যদের মত উচ্চস্তরের নিখুঁত ট্রেনিং কয়েদীরা না পাক, দল বাঁধিয়া ওয়ার্ডারের হুকুমে ওঠাবসা চলাফেরা করার কায়দাটা তারা আয়ত্ত করে। দুঃখের বিষয়, ভীমের দলে জেলের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কয়েদী কয়েকজন থাকিলেও সমস্ত দলটাকে পরিচালনা করিতে তাকে বেগ পাইতে হইল কম নয়। তবু যতটুকু শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলকে সে মাটি খুঁড়িবার কাজে লাগাইয়া দিতে পারিল তাও তার সাত বছর জেলে থাকিবার ফল। নিজেকে একদল কয়েদীর ভার-প্রাপ্ত ওয়ার্ডার কল্পনা করিলে ভীমের আনন্দ

হইত সন্দেহ নাই কিন্তু তার অনেক দিনের চিন্তা-পুষ্ট আরও বড়, আরও উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কাছে এসব কল্পনা এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। আকাশ আরও পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। জ্যোৎস্নার তেজ বাড়িয়াছে। বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ভীমের চোখ দুটি মিট মিট করিতে লাগিল। ভীমের চোখে আধা'বন আধা'বাগানটির মধ্যে বিশ্বের রহস্য আসিয়া আজ জমাট বাঁধিয়াছে, ভীতিকর সর্ব্বনাশা সম্ভাবনা এবং কারণহীন আতঙ্ক সে সমস্ত মিশিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে প্রত্যেকটি দুঃস্বপ্নের দেবদেবী ও ভূতপ্রেত, জীবনে শুধু যাদেরই চরম কর্ত্তৃত্ব। এদিকে নদীর জলরাশি ভাঁটা সুরু হওয়ার সম্ভাবনায় থম থম করিতেছে। এখন তার জল বাড়িবে না। আর কতটুকু উঠিতে পারিলে ঘোলাটে জল বাঁধটা ডিঙ্গাইতে পারিত? দেড় হাত? দু'হাত? এবার জল কমিতে আরম্ভ করিবে। সমুদ্রের জলের দেবতা নদীর জল শুষিতে আরম্ভ করিবেন। তা হোক, সে দেবতা ডাকাত নন, কৃপণ নন। শেষ রাত্রে জোয়ারের কৌশলে সমস্ত জল তিনি ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ইঙ্গিতে আসিবে মানুষের বুক সমান উঁচু ফেনিল সশব্দ বন্যা। ততক্ষণে ভীম তার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বছরের পর বছর ধরিয়া যে মাটির বাঁধ নদীর এই জল রাশিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, ঝপাঝপ্ শব্দে একত্রিশটি কোদাল শাবল ও খন্তা আজ ভীমের ইঙ্গিতে ক্ষয় করিয়া চলিয়াছে তার অঙ্গ। এখানে বাঁধের ত্রিশ হাতেরও বেশী অংশ হইয়া থাকিবে কয়েক হাত চওড়া মাটির একটা পর্দ্দা, জোয়ারের প্রথম আবির্ভাবে সে পর্দ্দা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তারপর কে ঠেকাইয়া রাখিবে জোয়ারের ক্রমবর্দ্ধনশীল নদীর দুরন্ত জলরাশিকে? একবার একটী সঙ্কীর্ণতম প্রবেশ পথ পাইলে নদীর জল দুপাশের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া

নিজের পথ বড় করিয়া নিবে নিজেই। বাঁধের এপাশের নদী গিয়া পৌঁছিবে বাঁধের ওপাশের গ্রামে। মাঠে ঘাটে পথে, বাড়ীর উঠানে, ঘরের রোয়াকে ঘরের মেজেতে, চৌকির বিছানায়—কে জানে আরও কত উঁচুতে উঠিবে নদীর জল! বাবুদের বাড়ীর দোতালার পৌঁছিতে পারিবে না এই যা আপশোষ। চোখের পলকে বন্যাটা গিয়া যদি সমস্ত গ্রামকে, বিশতলা জলের নীচে তলাইয়া দিতে পারিত, যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইত হরিখালি গ্রাম!

কুকী যদি গাছতলাতেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, সে বোধ হয় তবে ডুবিয়া মরিয়া যাইবে। যতখানি জল পৌঁছিবে সেখানে বেহুঁস ঘুমন্ত মানুষকে ডুবানোর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ভীমের মুখটা যেন হঠাৎ বিকৃত হইয়া নদীকে ভেংচাইয়া উঠিল। এ-মুদ্রা দোষটা বড় অবাধ্য।

প্যাঁক

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁসও বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। কেবল রান্না-করা হাঁসের শক্ত মাংস নয়, শকুন্তলার কাঁচা নরম নিটোল—

মোটরেরই দুটি হর্ণ যেন। কিন্তু বোবা। বিধাতা কি হর্ণ বাজান নিঃশব্দে?

গাছতলায় কাঁটা-ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরাফুলের শয্যা—

আর লেখা গেল না। সুশান্তের নাকে গন্ধ লাগিয়াছে চিংড়ী মাছ ভাজার, মনে ধাক্কা লাগিয়াছে আকস্মিক ক্ষোভের। মোটর কোথায়? শকুন্তলা? কোথায় হাঁস? রান্না করা হাঁসের শক্ত মাংস? গাছতলা, কাঁটা-ঝোপ, ঝরাপাতা, মরাফুল? মুখে একটা বিড়ি গোঁজা, হাতে একটা সস্তা কলম, তক্তপোষে একটা ময়লা চাদর, শীতের গোড়ায় ঘর জুড়িয়া একটা বর্ষাকালের ভাপ্সা গুমোট।

শূন্য ঘর, সেইজন্যই যেন আসলে যত ছোট তার চেয়েও ছোট মনে হয়।

তবু সব সহ্য হয় সুশান্তের, চোখের উপর যে পর্দ্দা পড়িয়াছে তাতে সব আড়াল হইয়া থাকে, কিন্তু এই কলম-ধরা শীর্ণ হাতের মুঠায় হর্ণ কই?

একতলার ভাড়াটে শিবচরণের মোটা শক্ত হাতের মুঠা হর্ণ বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত। বেচারী ট্যাক্সি চালায়, অনেকদিনের পুরানো একটা ট্যাক্সি। গাড়ীটা তার বৌ-এর চেয়েও পুরানো, বৌ তো সবে তার তৃতীয় সন্তানটির মুখে স্তন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিংড়ী মাছ বোধ হয় রাঁধিতেছে শিবচরণের বোন মালতী। সে-ই দুবেলা রান্না করে, কারণ শিবচরণের অন্ন তার দুবেলাই খাইতে হয়, এখনও স্বামী জোটে নাই। মালতীর জন্ম সুশান্তের মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা রান্না করে বলিয়া অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না। তবে মালতী কাঠির মত সরু বলিয়া যে নয় তাতে সন্দেহ নাই। কাঠির মত রোগা হোক, রোগে মেয়েটা ভোগে না। একতলাটা শিবচরণ ভাড়া নিয়াছে বছর দুই, এই দু'বছরের মধ্যে মেয়েটা না পড়িয়াছে একদিনের জন্ম জ্বরে, না ধরিয়াছে একদিনের জন্ম তার মাথা, পুরানো মোটর হুডে আড়াল করা পিছল কলতলায় একদিনের জন্ম আছাড় পর্য্যন্ত সে খায় নাই। মনস্তত্ত্বের খান কয়েক বই পড়িয়া মনের ভাব বিশ্লেষণ করিবার স্বাভাবিক অন্ধ ক্ষমতাটা বজ্রাহত চারার মত মরিয়া গিয়াছে, নিজের মনে যে ভাব জাগে নিজেই তার একটা কারণ নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিতে সে আর পারে না, তাই শুধু অনুমান করে যে হয়ত মালতীর মুখের চিরস্থায়ী অতি মৃদু পুলকের ছাপটা তার মমতার কারণ। কিছু নাই মালতীর, তবু যেন কোন একটা কারণে সে কিছু চায় না, আলস্যের মত অতি জলো একটা আনন্দ দিবারাত্রি বিনামূল্যে উপভোগ করে। কি ভাবে এক চামচ চিনি সংগ্রহ করিয়াছে বেচারী, তাই দিয়া তৈরী করিয়াছে এক পুকুর সরবৎ, ক্রমাগত পান করিয়া যায় তবু ফুরায় না।

দামী প্যাডের উপর সস্তা কলমটা রাখিয়া সুশান্ত ঘরের সম্মুখে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায়। দেড় হাত চওড়া ত্রিকোণ রোয়াকে, তিন-দিকে চারখানা ঘর, একটিতে সুশান্তর মা দুবেলা রাঁধেন, স্বামী-পুত্রকে ভাত বাড়িয়া দেন আর দুবেলা ভাতের হাঁড়ি চাঁছিয়া মাছের কাঁটা বাছিয়া

ডাল তরকারীর পাত্র পুঁছিয়া স্বামীর থালাতে জড়ো করেন, পেট নাকি তাঁর এই ভাবেই দুবেলা আকণ্ঠ ভরিয়া ফেলা সম্ভব হয়।

সুশান্তের মার এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শিবচরণের বৌ জানে। তাই মাঝে মাঝে ঠিক এই সহানুভূতি জানাইতে পাঠাইয়া দেয়। পাঠায় সে অন্য মতলবে, কিন্তু মালতীর মনে হয় কুকুর বিড়ালের মত থালা বাটি চাটিয়া পেট ভরানোর কৌশলটা শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিজেকে একই দুঃখে দুঃখী মনে করায় সহানুভূতিটা সে জানাইতে পারে আন্তরিক আর গভীর। দুচোখে জল পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে।

'ওই খেয়ে কি করে বাঁচবেন মাসীমা?'

সুশান্তের মা বাঁ হাতে কপালে করাঘাত করেন।

'কোন সাধ কি মিটবে, কপাল যে পোড়া!'

মালতীর সহানুভূতি আরও গভীর হইয়া আসে। বুকের ভিতর তোলপাড় করে।

'কপাল না পোড়া হলে ছেলে আমার বিগড়ে যায়, তোর মত লক্ষ্মী মেয়েকে বৌ করতে পারি না! দেবে এবার তোর দাদা তোকে কার হাতে বিলিয়ে, আমার শেষে জুটবে একটা অলক্ষ্মী পেত্নী। আমার অদেষ্টে সুখ নেই মালতী।'

দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত জোটার চেয়ে দরদী ছেলের বৌ থাকাটা বেশী সুখের কিনা মালতী জানে না। তার বিগড়ানো ছেলের হাতেই বোনকে দিবার জন্য শিবচরণ যে ওৎ পাতিয়া আছে, সুশান্তের মাকে কোন কৌশলে এ সংবাদটা দিতে না পারিয়া মনটা খুঁত খুঁত করে মালতীর। একটু ভাবিয়া এতক্ষণের আন্তরিক দরদের সঙ্গে আরও খানিকটা কৃত্রিম দরদ জানায়, দরদ জানান ছাড়া আর কিছু তো তার করিবার উপায় নাই।

'যা রাঁধেন সব দিয়ে দেন, নিজের জন্তে কিছু রাখেন না। আমি হলে—'

'নেই বাছা নেই, অদেষ্টে আমার সুখ নেই। ছেলেটা নইলে মানুষ হয় না? তোকে বৌ করে এনে দুটো দিন একটু সুখের মুখ দেখতে পাই না?'

আর সকলের মত, জীবনযাত্রার মত, কথাও দুজনের এক সুরে বাঁধা। এক সময়ে কেবল একটা আপশোষ থাকে, অন্ত আপশোষগুলি খাজনা দিয়া রাজার মত তাকেই করে পুষ্ট।

'চিংড়ী মাছ রাঁধছিলি তুই?'

'হ্যাঁ, এই বড় বড় চিংড়ী মাসীমা, তেরোটাতে প্রায় দু'সের হবে। ভাজতে গিয়ে সব তেল ফুরিয়ে গেল বলে বৌ এমন বকছিল।'

'কত করে সের নিলে?'

'কেনা নয় তো, কে যেন দাদার গাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল। কার জিনিস কে খায়।'

একটু লজ্জা বোধ করে মালতী, কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ী মাছ, তাও সংখ্যায় তেরটা, ভাগ দেওয়া উচিত ছিল বটে। কিন্তু সুশান্তের মা নিশ্চয় জানেন ভাগ দেওয়া না দেওয়ার মালিক সে নয়? একটু আমতা আমতা করিয়া মালতী বলে, 'একটা মাছ এনে দেব মাসীমা? দিই না, এঁ্যা?'

ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। যদি রাজী হইয়া যান সুশান্তের মা, যদি সস্নেহে হাসিয়া বলেন, দিবি আচ্ছা দে! তারপর বৌদি যদি সুশান্তর মাকেও একটা চিংড়ী মাছ ভাগ দিতে রাজী না হয়, তার স্বামীর কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ী মাছ? ভাগাভাগি বৌদি ভালবাসে না। সে মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু এবিষয়ে স্বভাবটা দুর্যোধনের মত।

কারণ-না-জানা মমতাটুকুর জন্যই সুশান্তর রোয়াকে দাঁড়ান। খাওয়ার সময় সুশান্তর মাকে সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিবার সময় রোয়াকে তাকে না দেখিলে মালতী রাগ করে, এত বেশী রাগ করে যে সেদিন রাত্রে সে আর আসে না। অনেক রাত্রে ট্যাক্সি নিয়া ফিরিয়া আসিয়া বার কয়েক হর্ণ-টা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া শিবচরণ বাড়ীর আর পাড়ার অনেকের ঘুম ভাঙ্গায়। মালতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, ভাত বাড়িয়া দেয়, শিবচরণ শুইয়া পড়িলে নিজেও শোয়, হর্ণের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে যাদের ঘুম ভাঙিয়াছিল তাদের মত আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু আর উঠিয়া আসে না। দামী প্যাডে সস্তা কলমের আঁচড় কাটিয়া, মাঝে মাঝে একটা দুটা সিগারেটের মেশাল দিয়া বিড়ি টানিয়া, বার বার রোয়াকে গিয়া নীচের অন্ধকার উঠানের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাত্রি জাগাই সুশান্তর সার হয়। কত করিয়া মালতীকে সে বুঝায়, কত বলে যে অমন মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মালতী চলাফেরা করে, রোজ কি তার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব সে কখন উপরে আসিয়াছে, দু'একদিন সময় মত রোয়াকে গিয়া না দাঁড়াইলে তার কি রাগ করা উচিত?

মালতী বুঝিয়াও বোঝে না।

'পায়ের আওয়াজ নাই বা পেলে, আমি ওপরে আসি মাসীমা যখন খেতে বসেন তখন।'

'মা কখন খেতে বসে জানব কি করে?'

'খেয়াল রাখলেই জানা যায়। তোমাদের খাইয়ে তবে মা ফেলা ছড়া যা থাকে নিয়ে—'

আলাপ আলোচনার এদিকটা সুশান্ত এড়াইয়া যায়। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'তুমি কিছু বোঝ না। লিখতে বসলে আমার কি কিছু

খেয়াল থাকে, না, খেয়াল থাকলে লেখা যায়? নিজে যদি লিখতে তা হলে বুঝতে মানুষের গভীর মনের সুখদুঃখের রূপ দিতে হলে বিশ্বসংসারকে ভুলে যেতে হয়। তুমি বুঝবে না মালতী, বুঝবে না।'

অন্য সকলের মত, জীবনযাত্রার ক্ষোভও এক সুরে বাঁধা। ক্ষোভের জ্বালায় মাথার মধ্যে পর্য্যন্ত যেন ঝিম ঝিম করে, মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া সে বলে, 'বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী।'

মালতী অবশ্য দরদের সঙ্গেই বলে, মানুষ যা বোঝে না মানুষকে তা বোঝাবার দরকার? কিন্তু মালতী তো বোঝে না এক ধরণের মানুষ আছে জগতে এক ধরণের দরদের সঙ্গে এক ধরণের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ুগুলি ফাঁসির আসামীর মত আড়ষ্ট হইয়া যায়—মনে হয় জীবন-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা আসিয়া গিয়াছে জীবনটার মাঝামাঝি।

আসলে নিন্দাপ্রশংসার কথা নয়, বোঝা না বোঝার প্রশ্ন নয়, অন্য মানুষকে খুন করিয়া ক্রমাগত ফাঁসি কাঠে আত্মহত্যা করিতে গেলে ক্ষোভ জাগিবেই। অনাবৃত বিবর্ণ কাঠের টেবিলে দামী প্যাড পাতিয়া সস্তা কলমের সাহায্যে একটা আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধে যত বাছা বাছা লোক মরে তার চেয়ে বেশী লোক মারিবার ফন্দি আঁটিতে থাকিলে এ বিপদটা অবশ্যম্ভাবী। মাথায় লাঠি মারিয়া এ যন্ত্রণার অবসান করিবার যদি কেউ থাকিত, ছাদটা হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা যদি থাকিত, অন্ততঃ শকুন্তলাকে পাশে নিয়া যারা গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরা পাতা আর মরা ফুলের শয্যার উদ্দেশ্যে সত্য সত্যই উধাও হইতে জানে এবং পারে তাদের মধ্যে একজনও যদি সজোরে হর্ণ টিপিয়া বীভৎস প্যাঁক প্যাঁক শব্দে সতর্ক করিয়া দিতে দিতে মাডগার্ডের ধাক্কায় বিশ পঁচিশ

হাত তফাতে গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরা পাতা আর মরা ফুলের শয্যায় ছিটকাইয়া দিত, ক্ষমতা থাকিলে গালাগালি দিবার ছলে সুশান্ত তাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া ছাড়িত না।

মোট কথা, মালতীর ফিরিয়া যাওয়ার সময় রোয়াকে না দাঁড়াইয়া থাকিলে মালতী আর ফিরিয়া আসে না।

সুশান্ত বাবাকে গিয়া বলে, 'মোটর-ড্রাইভিং শিখব বাবা?'

শিবনেত্র হইয়া তামাক টানাটা অনাথবন্ধুর স্বভাব। মুখের দিকে না চাহিলে বোঝা যায় না তার গাম্ভীর্য্য আসলে জড়বস্তুর প্রাণহীন আলস্যের নকলনবিশী। তবু মানুষটা তো জীবন্ত, রোজ আপিস যাতায়াত করেন। তাই ছেলের প্রস্তাবে থতমত খাইয়া রাগিয়া উঠিতে পারেন।

'যা শেখ গে মোটর-ড্রাইভিং—দূর হয়ে যা।'

মোটর-ড্রাইভিং শিখিবে। ছোটছেলের খেলনার মোটরের মধ্যে যেটুকু বাস্তবতা আছে তার সঙ্গে পরিচয় করিতে যার দম বন্ধ হইয়া আসিবে, সে শিখিবে মোটর-ড্রাইভিং, সে করিবে মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জ্জন। তাছাড়া ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে না। কষ্ট করিয়া মোটর-ড্রাইভিং শিখিবার কি দরকার, রিকসা টানুক না সুশান্ত? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন!

রাগে আগুন হইয়া অনাথবন্ধু স্নান করিতে গেলেন, আপিসের বেলাও তখন হয় নাই, সুশান্তর মার আপিসের রান্নাও শেষ হয় নাই। দেহে জল ঢালিলে মনের যে রাগের আগুন নিভিয়া যায়, অনাথবন্ধুর রাগটা

সেই সাধারণ পর্যায়ের। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া ছেলেকে তিনি ডাকিলেন।

'কোথায় শিখবি মোটর-ড্রাইভিং ?'

'স্কুল আছে, মোটর-ড্রাইভিং-এর সঙ্গে মেক্যানিকাল ট্রেনিংও দেবে, ছয়মাসের কোর্স।'

অনাথবন্ধু আবার থতমত খাইয়া রাগিয়া উঠিলেন।

'মাইনে দিয়ে শিখবি ? স্কুলে ? তোর যত সব উদ্ভট খেয়াল।'

'তিন মাসেরও একটা কোর্স আছে বাবা, মাইনে বেশী নয়।'

'না না, ওসব মোটর-ড্রাইভিং শিখতে হবে না। একদিন আলু আনতে দিলে যে পাকা পটল কিনে আনে তার আবার মোটর-ড্রাইভিং। মানুষ চাপা দিয়ে জেলে যাবি তো শেষে।'

আজ সকালেই বাজারে আলু কিনিতে গিয়া সুশান্ত পটল কিনিয়া আনিয়াছিল, পাকা শুকনো পটল। বাপের যুক্তিটা তাই অস্বীকার করা গেল না।

তবে শিবচরণের কাছে শিখিতে বাধা নাই। মোটর চালনায় তালিম দিতে শিবচরণের আগ্রহই দেখা গেল, খুঁত খুঁত করিল সে অন্যদিকে। পথের বাস্তবতার ছাপ মারা কর্কশ মুখের চামড়া খোঁচ করিয়া, কলহ কলরবে মজবুত কণ্ঠস্বরকে ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়া ভয়ে ভয়ে সে বার বার বলিতে লাগিল, চাকরী বাকরী না করিয়া এসব কেন ?

'আমি ভাবলাম সখ করে শিখতে চান, নইলে গাড়ী চালান শিখে আপনার দরকারটা কি দাদা, এঁ্যা ? একি ভদ্দরলোকের কাজ, এতে কি আর পয়সা আছে !' শিবচরণ ভীত চোখে চাহিয়া থাকে, আহা

রোগা দুর্ব্বল বোনটাকে ভদ্রলোকের হাতে দিবার কল্পনা কি তার শেষ হইয়া গেল।

সুশান্ত বলে, 'চাকরীর চেয়ে তো পয়সা বেশী আছে।'

'কে বললে আছে, ওসব আজগুবি কথা মশাই, না জেনে অমন সবাই বলে। এগার বছর এ লাইনে আছি, আমি জানিনা ভিতরকার খবর? উপায় থাকলে আদিত দাদা একটা দিন গাড়ী হাঁকাতাম না। আদ্ধেক খাটুনির দাম উঠে না, মানুষ এ লাইনে আসে।'

পরম ক্ষোভের চরম আঘাতে যে ঝোঁক চাপিয়াছে, শিবচরণের উপদেশে সেটা যাইবার নয়। কোনদিন সকালে কোনদিন বিকালে শিবচরণের সঙ্গে সুশান্ত বাহির হইয়া যায়, প্রথম মোটর গাড়ী চড়িবার আরামে গাড়ী চালানর সহজ ধরা বাঁধা কৌশলগুলিও একরকম কিছুই শেখা হয় না। শিখিবার ঝোঁকটা কিন্তু সমান থাকিয়া যায়। কয়েক-দিন পরেই সখটা তার মিটিয়া যাইবে, ভদ্রত্বের স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য আর সে আবদার ধরিবে না,—শিবচরণের এই আশাটা যেন সফল হইবে না মনে হয়।

সুশান্ত বলে, 'এমন কি মন্দ রোজগার? বেশ তো আরামের কাজ।'

শিবচরণ বলে, 'শুনুন একটা কথা বলি আপনাকে। এসব কাজের জন্য একটু কাটখোট্টা শক্ত শরীর দরকার হয়, আপনার কি জানেন তেমন জোরাল শরীর তো নয়, মানে ভদ্রলোকের দেহ তো আপনার, এসব কাজ আপনার পোষাবে না।'

শিবচরণ অবশ্য দরদের সঙ্গেই কথাগুলি বলে, কিন্তু মালতীর মত সেও বোঝে না একধরণের মানুষ আছে জগতে একধরণের দরদ দিয়া একধরণের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ু ফাঁসির আসামীর

মত উত্তেজিত হইয়া উঠে! আর সে উত্তেজনা কাজে না লাগায় বড় কষ্ট পায়।

এক মাস সুশান্ত ধৈর্য্য ধরিয়া খেয়াল মাফিক মোটর চালান শেখে। মন দিয়া উৎসাহের সঙ্গে শেখে, কিন্তু এক মাসে অভিজ্ঞতা জন্মে যেন মোটে এক দিনের। পথের বাস্তবতা ধূলাবালি আবর্জনার চেয়ে নোংরা, অসংখ্য মানসিক ব্যাধির বীজাণুতে বোঝাই। শিবচরণের মত অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পাকা যোদ্ধাকে সম্মুখে রাখিয়া একরকম দর্শক হিসাবেই সুশান্ত জীবনের এই প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে নামে, তবু এক মাসেই হৃদয় মন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না—একটা আদর্শ টিঁকে না, একটা থিয়োরি খাটে না, একটা সৎ বা সংস্কার স্থায়ী প্রশ্রয় পায় না, এ কোন্ জগৎ? সেই বা এতদিন এমন কিসের আড়ালে বাস করিয়াছে যে পথে ভাড়াটে মোটরে ভাড়াটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানকে বাঘ ভাল্লুক দৈত্য দানবের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে অবিরাম ছুটিয়া পালানর মত মনে হয়। তার বাড়ীতে পথের বাস্তবতা চিরদিন ছিল, এখনও আছে, পায়ে পায়ে পথের ধূলা যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তেমনিভাবে পথের বাস্তবতা মনে মনে প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের ধূলার মত এই বাস্তবতাকেও তাই ঝাঁটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দরকার হয়, সকাল সন্ধ্যা ঘর ঝাঁট দিলেও যেমন আনাচে কানাচে পথের ধূলা থাকিয়া যায়, শত ব্যবস্থার মধ্যেও পথের বাস্তবতাও তেমনি আনাচে কানাচে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। তবে চাহিয়া না দেখিলে চোখে পড়ে না। দেখিতে না জানিলে চাহিয়া দেখা যায় না। শুধু অস্বীকার করিয়া যাওয়া চলে।

এক মাসে সুশান্ত এতখানি দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চয় করে। প্রশস্ত রাজপথে, আঁকা বাঁকা সরু গলিতে শিবচরণের মোটর চালানর নির্ভয় নিশ্চিন্ত নিপুণতা আজকাল তাকে বড় ক্ষুব্ধ করিযা তোলে, সে বুঝিতে পারে এভাবে এজীবনে এমন নিখুঁত মোটর চালান সে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এমন কি শিবচরণের হাতে গাড়ীর হর্ণ যেমন বাজে, তার হাতে কোনদিন সেভাবে বাজিবে না। কতবার কতভাবে সুশান্ত হর্ণটা বাজাইয়া দেখিয়াছে, প্রত্যেকবার মনে হইযাছে সুব কাটিযা গেল, আওযাজটা জমিল না।

তবে একটা যা ব্যাপার ঘটে, সুশান্ত কোনদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

মালতীর মৃদু, অসহায় একটানা আনন্দেব মধ্যে হঠাৎ সে যেন একদিন ঢেউএর আবির্ভাব অনুভব করিতে পাবে। জড় পদার্থ ছাড়া যতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব আব কিছুর মধ্যেই বোধগম্য হইবার নয়, ততটুকু পুলকেব আতিশয্যও মালতীর মধ্যে অসাধাবণ। হাত ধবিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিযা মালতী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, 'এক মাস গাড়ী চালাতে না চালাতে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল?'

সুশান্ত কৈফিযৎ দিবার ভঙ্গিতে বলে, 'প্রথম প্রথম—'

মালতী অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, 'পড়ুক, পড়ুক, ফোস্কা পড়াই ভাল—সমস্ত হাতে ফোস্কা পড়ুক।' বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে থাকে: 'বুঝবেনা, বুঝবেনা, তুমি বুঝবেনা।'

কারণে অকারণে মোটরের হর্ণ বাজাইলেই হাতে চিরদিন ফোস্কা পড়েনা—পথিককে সতর্ক করার জন্য কে তবে হর্ণ বাজাইত, মোটরের জন্য

অন্য ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু সুশান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পাবে, শব্দের অর্থ রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কাগজে যেভাবেই হর্ণ বাজানর কথা সে লিখুক, শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে আগের মত অভদ্রভাবে মনের মধ্যে বিচরণ করিতে ছুটিয়া আসেনা। তাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়। আনিলেও পরাশরের সত্যবতীর মত তাব জন্য কিছু কিছু কুয়াশা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয়।

এক মাস পরে তাই আবার একদিন সুশান্ত সস্তা কলমে কালি ভরে। দামী প্যাডের লেখা পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করে।

মোটর বললে, পঁ্যাক।

হাঁসও বললে, পঁ্যাক।

মোটর থামিয়ে মাংস পেলাম। হাঁসটার মাংস শক্ত, কিন্তু শকুন্তলা চমৎকার রান্না করে। মাংসের গন্ধে অদূরের গাঁ থেকে গোটা দুই কুকুর এসে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। গাছতলার কাঁটা ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরামুকুলের শয্যায় বসে তাদের নিঃশব্দে আবেদন দেখতে দেখতে মনে হল, বিধাতা তো শুধু শকুন্তলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভাষা দেননি! বোবা কিছু সৃষ্টি করা কি বিধাতার ক্ষমতার বাইরে?

বিষাক্ত প্রেম

মানুষের মনের মিল তো, যখন তখন যেমন তেমন অবস্থায় যার তার সঙ্গে অনায়াসেই হতে পারে। সত্য আর সরলার মনের মিল হতেও এক-মাসের বেশী সময় লাগলনা। অপরে যেখানে বাদ সাধেনা, মাথা ঘামানও দরকার মনে করেনা, সেখানে সেই মিলন হতে মনের মিলটাই সাধারণতঃ যথেষ্ট, যে-মিলনটা মনের মিলের স্বাভাবিক পরিণতি। মনের মিলই তো প্রেম। কিন্তু সত্য আর সরলার মনের মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনটা যেন তারাই নিষ্প্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে রেখে দিল। পরস্পরকে না দেখে তাদের মন করতে লাগল কেমন কেমন, কিন্তু তারা কেউ টের পেলনা যে একসঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ না করে তাদের আর উপায় নেই।

ঘটনাচক্রে মনের যে তাদের মিল হয়ে গেছে, সরলার চেয়ে এ বিষয়ে সত্যই যেন হয়ে রইল বেশী উদাসীন। একেই তো লোকটা সে একটু চাপা, তার উপর তার ব্যবসা হ'ল চুরি—সরলার ঘরে আসা-যাওয়াও সে আরম্ভ করেছে একদিন সুযোগ মত তার গয়না আর টাকা নিয়ে পালাবার মতলবে। জীবনে কোন কিছুর অভিব্যক্তি না হওয়াটাই সত্যর পরম কাম্য। যা-কিছু হবার গোপনেই হোক, জীবিকার্জ্জন থেকে জীবন-যাপন পর্য্যন্ত। নিজের মনটা চুরি গিয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করবার মানুষ সত্য নয়।

অবশ্য সরলার ঘরে প্রথম রাত্রে সে এসেছিল প্রচলিত মন-চোরার বেশে। মন-চোরার বেশটা কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়ী থেকে। বাড়ীতে পর্য্যন্ত চোরের ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে থাকে তারাই জানে, ব্যবসায়ীটির নিজের ঘরে সত্য সুবিধা করতে পারেনি। তার বিগড়ে-যাওয়া ছেলেটার ঘর থেকে কেবল সংগ্রহ করে এনেছিল রাত্রিচর বাবু সাজবার সরঞ্জাম—ধুতি পাঞ্জাবী, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম ইত্যাদি। একজোড়া নতুন জুতো কিন্তু তাকে কিনতে হয়েছিল। তবে জুতো কেনার পয়সাটা জুটেছিল ব্যবসায়ীর বিগড়ে যাওয়া ছেলেটারই মনিব্যাগে। কিন্তু যতই হোক, এমনিভাবে পরের মনিব্যাগ থেকে পয়সা রোজগার করাটা যখন সত্যর জীবিকার্জ্জনের উপায়, হাতে-আসা পয়সা খরচ করে দামী জুতো কিনতে হওয়ায় মনটা তার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বৈকি। মোটামুটি বলা যায়, জামা কাপড়ের সঙ্গে মানানসই জুতো কেনার সখটাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনেই সে সরলার ঘাড় ভাঙবার মতলব ঠিক করেছিল। পায়ের জুতোর মৃদু মসমসানি আওয়াজ কানে এলে মনের মধ্যে কেবলি মৃদু আপশোষ আর অস্বস্তি জাগতে থাকবে, এ অবস্থার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে মানুষ ক'দিন ঠিক থাকতে পারে?

রূপ ব'লে সরলার কিছু নেই। এ একটা অতি বড় সম্পদ সরলার—অতি বড় আকর্ষণ। সবাই রূপসী বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসী বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোন একটা মতামত ঠিক করে ফেলবার অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোন পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয়না, ভীরু পুরুষেরা তাকে ভারি পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যে-সব পুরুষের স্বভাব,

তারা বড় ভীরু। সরলার গায়ে গয়না আর ঘরে আসবাব আছে তাই অনেক।

তবে গায়ের গয়না অধিকাংশই গিল্‌টি-করা, ঘরের আসবাব অধিকাশংই নীলামে-কেনা। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস। আসল সোনার গয়নাগুলি সরলা রেখেছে লুকিয়ে, গায়ে বাথার চেয়ে লুকিয়ে রাখলে গযনা যে নিরাপদ থাকে এখবর জানা থাকায গাযের গিল্‌টি-করা গযনার জন্ত তার কোন আপশোষ নেই। আসবাবগুলি তার আদায়-করা উপহার, —আদায়-করা উপহার যে সাধাবণতঃ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস হয এ থববটাও জানা থাকায, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আসবাবেব জন্তও তার কোন আপশোষ নেই। তাছাড়া, তিন পুরুষের একটা ভাঙা খাট আর উই-এ ধরা আলমাবিতে সাজান স্বামীর ঘবথানার তুলনায সাহেববাড়ীর নীলামে-কেনা আসবাবে সাজান ঘরের শোভাই কি কম মনোহর! খাটখানা সবলাব নতুন—এই ঘরে মদ খেতে খেতে সাতবছর আগে যে-লোকটা হার্ট ফেল করে মরে গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সরলার স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। তা হোক। সাতবছরে অনেক স্মৃতি উপে যায, কিন্তু দামী খাট পুরানো হযনা।

এই যে সত্য আর এই যে সরলা, কিছুদিন অযাচিতভাবে তারা পরস্পবকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কবতে লাগল যে, একজনেব জন্ত অপরের মনে ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, বড় ভাল তারা, বড় সরল, আনন্দের নামে হৈ চৈ করতে তাদের পটুত্ব অসাধারণ, দুজনেব মধ্যে মিল যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

তারপর দুজনের হ'ল মনের মিল।

কিন্তু কথাটা যতদিন মিথ্যা ছিল ততদিন বিশ্বাস করান গিয়েছিল সহজেই, এখন কে একথায় বিশ্বাস করবে ? বিশ্বাস করিয়ে লাভও নেই, বিশ্বাস করবার উপায়ও নেই। সোজাসুজি মুখে বলে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, বড় বড় প্রতিজ্ঞা করে দেবদেবীর নামে দিব্যি কেটে জানালেও ফল হবে সেই একই। সত্যর লুকানো গয়না আবিষ্কারের ফন্দি-ফিকির ফাঁদের মত সরলাকে যেমন ফাঁপরে ফেলে রেখেছে তেমনি ফাঁপরেই ফেলে রাখবে, সরলার টাকা আর উপহার আদায়ের চেষ্টা সত্যকে যেমন বিপদগ্রস্ত করে রেখেছে তেমনি বিপদগ্রস্তই করে রাখবে। মনের মিল হোক বা না হোক, কারোর জন্য সোনার মায়া বিসর্জ্জন দেবার ক্ষমতা যে সত্যর নেই, টাকার মায়া বিসর্জ্জন দেবার ক্ষমতা যে সরলার নেই !

সরলা ভাবে, লোকটা যদি চোর না হ'ত ! দাবী-দাওয়া নিশ্চয় কিছু কমাতাম, আদর যত্নের পরিমাণ নিশ্চয় কিছু বাড়াতাম, বেশী বেশী সময় কাছে রাখবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীছাড়া যে চোর' বদমাস।

সত্য ভাবে, ছুঁড়ি যদি ঝানু না হ'ত ! ঘাড় ভাঙার মতলবটা নিশ্চয় বন্ধ রাখতাম, যা রোজগার করি নিশ্চয় সব এনে দিতাম, একটা বোঝাপড়া করে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গাড়তাম। বজ্জাত যে পাকা কাব্‌লিওয়ালী !

এইসব ভাবে আর দুজনেরি গা জ্বালা করে।

গা জ্বালা করে আর দুজনেই মনে মনে আপশোষ করে যে, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি বাবা, ভাবনায় চিন্তায় দেহ গেল।

আপশোষ করে আর সত্য ভাবে, যত শীগগির সম্ভব কাজটা হাসিল করে পালাবে।

আপশোষ করে আর সরলা ভাবে, আদায়ে একটু ভাঁটা পড়লেই লোকটাকে তাড়াবে।

একদিন বিকাল বিকাল হাজির হয়ে সত্য বলে, কতগুলো টাকা পেয়েছি সরলি, আজ একটু ফূর্ত্তি করা যাক অ্যাঁ?'

সরলা খুসী হয়ে বলে, 'কত টাকা পেয়েছিস? কোথায় পেলি?'

এক চোখ বুজে সত্য মুখের যে ভঙ্গি করে তার তুলনা নেই, 'পেলাম।'

জগতে পাওয়াটাই সত্য। কি উপায়ে কোথায় কি পাওয়া গেল তার বিচার করতে বসে কেবল তার্কিক। সরলা তাই খুসীতে গদ গদ হয়ে বলে, 'জেলে যাবি বাপু তুই একদিন।'

বিপদ মাথায় করে উপার্জ্জন করে এনে পুরুষ যখন হাতে তুলে দেয়, তখনকার মত দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত মেয়েমানুষের জীবনে আর কখন আসে? সরলা গদ গদ হয়েছে টের পেয়ে সত্যও গদ গদ হয়ে বলে, 'যাই তো যাব জেলে, তোর জন্য যাব তো?—বয়ে গেল!'

সরলা আরও গদ গদ হয়ে বলে, 'ইস্!'

শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয়নি, তবু কি যেন কামড়ায়। কামড়ায় অবশ্য সেই সাপের মত, যে-সাপ কোন অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।

তাই মুখখানা বিমর্ষ করে সত্য বলে, 'এক কাজ করি আয় আজ, একটা বড় বোতল এনে রেখে বায়স্কোপ দেখতে যাই চল,—ফিরে এসে ফূর্ত্তি জমান যাবে। ভাল করে সাজিস কিন্তু, সবাই যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে তোর দিকে।'

'আসমানী রঙের শাড়ীটা পরব ?'

এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যকে একটু ভাবতে হয়।

'বেগুনিটা পরলে হ'তনা ?—আচ্ছা পর, আসমানিটাই পর। বেগুনি আর আসমানি দুটোর যেটাই পরিস, এমন দেখায় তোকে মাইরি—সত্যি যেন তুই কার বৌ।'

'ইস্ !'

সত্য হাই তুলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, 'গয়নাগুলো বদ্‌লাস কিন্তু—গিল্‌টি দেখে লোকে হাসবে, আমার কিন্তু লজ্জা করবে।'

এ সমস্যাটা সত্য সত্যই জটিল। সরলা কিন্তু চোখের পলকে মীমাংসা করে বলে, 'তুই বুঝি ভাবিস গিল্‌টি পরে যেতে আমার লজ্জা হয় না ? যা না, টিকিট কেটে আনগে না তুই, আমি এদিকে বোতল-ফোতল আনাই, সেজেগুজে ঠিক হয়ে থাকি।'

সত্য সাত বছরের নতুন খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে বলে, 'টিকিট কাটতে যাব কি, চার আনার টিকিট তো নয়। দুজনে একবারে গিয়ে টিকিট কাটব।'

কিন্তু এ ফিকিরও তার সার্থক হয় না, কখন কোন্ ফাঁকে সরলা আসল সোনার গয়নাগুলি গোপন স্থান থেকে বার করে আনে সত্য টেরও পায় না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু, সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'কখন বদলালি গয়না ?'

'এই তো মাত্তর।'

সত্যর বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'এই মাত্তর !—কোথায় ছিলরে ?'

আদায়-করা উপহার নীলামে-কেনা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আলমারিটার

দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে বিনা দ্বিধায়ঃসরলা বলে, 'ঐ আলমারিতে, আবার কোথা ?'

এমন নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার তার জবাব দেবার ভঙ্গি এবং এমন স্পষ্ট, জোরাল তার জবাব যে, এক বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ হতে পারে। সরলার গয়না কোনদিন আলমারিতে লুকান ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনদিন থাকবে না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছা হয় বলে সত্য দাঁত বার করে হাসে। সরলাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে বলে তাকে বেশীরকম আদর করে। একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই জেনে মনটা যত তার ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, রসিকতা করে ততই সে সরলাকে হাসায়। সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে যায় দেশী ফিরিঙ্গি হোটেলে, পচা চপ আর দামী বিলাতী মদ খাওয়ায়।

সরলা বলে, 'ঘরেই তো ছিল, আবার এখেনে কেন ?'

'আজ একটু প্রাণ ভরে ফূর্ত্তি করতে সাধ যাচ্ছে।'

'কেন, আজ কি ?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটা সংশয়, মৃদু একটা ভয় ধরা পড়ে। সত্য সাবধান হয়ে বলে, 'অতগুলো টাকা রোজগার করলাম যে আজ ?' বলে' দাঁত বার করে হাসে না, সরলাকে আর বেশীরকম আদর করে না, বেশী বেশী রসিকতা করে হাসায় না।

ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পরে সরলা তাই জিজ্ঞাসা করে, 'হঠাৎ যে আবার মুখ ভার হ'ল ?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভয় ও সংশয় স্পষ্টতর প্রকাশ পাওয়ার সত্য আবার সাবধান হয়ে বলে, 'না, মাইরি না। মুখ ভার হয়নি।'

জবাবটা স্বাভাবিক হওয়ায়, বড়রকম কৈফিয়ৎ না থাকায়, একটু নিশ্চিন্ত হলে সরলা স্ফূর্তি জমানর আয়োজন করে। বোতলের রসালো বিষে কখন কোন্ ফাঁকে যে সত্য কাগজের মোড়কের খানিকটা গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়, সে টেরও পায় না। সত্যকে ফাঁকি দিয়ে লুকানো গয়না বার করতে সে যেমন পটু, ফাঁকি দিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে দিতে সত্যও তার চেয়ে কম পটু নয়।

বিষে বিষক্ষয় হবার নিয়মটা এ ক্ষেত্রে বোধ হয় বাতিল হয়ে যায় এজন্য যে বোতলের বিষকে লোকে সুধা বলে, মনেও করে তাই। মুখ বিকৃত করে সরলা বলে, 'থুঃ, কি খাওয়ালি আমাকে তুই? কি বিচ্ছিরি স্বাদ!"

সত্য অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পচা চপ্ খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার!—নে, পান খা একটা।' বলে সস্নেহে তার মুখে পান গুঁজে দেয়।

তারপর সরলা আরও খানিকটা বিষ পান করে আরও কাতর হয়ে বলে, 'গা কেমন করছে। মাথা ঘুরছে। আর খাব না আমি।'

সত্য আবার অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পান খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার।—আয় মাথাটা টিপে দিই।'

তারপর সত্যর কোলে মাথা রেখে সরলা ছটফট করে, গোঙায়, মুখে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম করে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যের মুখের দিকে, দুহাতে সত্যকেই জড়িয়ে ধরে বিষক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে, অপমৃত্যুকে জয় করার চেষ্টায় সাহায্য চায়, আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিথিল, অবসন্ন নিঃশব্দে নিশ্চেষ্ট হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেয় সত্যর হাতে, কিছু চেতনা কেবল থাকে

চোখে আর চোখ দেখে মনে হয় ভেতরেও যেন একটা অদ্ভুত নির্ব্বোধ চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

একেই বলে জীবনপাত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। যার সঙ্গে মনের মিল হয়েছে তাকে মরণাপন্ন করে কিছু গয়না আর টাকা সংগ্রহ করা। বিবর্ণ পাংশু মুখে সত্য একে একে সরলার গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নেয়, সরলার আঁচলে বাঁধা চাবির সাহায্যে লুকানো ও জমানো টাকাগুলি খুঁজে খুঁজে বার করে। কিন্তু সব সংগ্রহ করে পালাবার সময় বিষাক্ত প্রেমের বিষক্রিয়ায় সত্যর পাও যেন অবশ হয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করে। বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সরলার পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কার সাধ্য কল্পনা করে সে পাকা মেয়ে, জবরদস্ত্ কাব্‌লিওয়ালি। তাড়াতাড়ি পালানই ভাল, কিন্তু সত্য জানে, সমস্ত রাত এ ঘরে কেউ আসবে না, দরজা বন্ধ থাকলে কাল অনেক বেলা পর্য্যন্ত সরলার খোঁজ পড়বে না। মুখের গাঁজলা মুছিয়ে মাথায় একটু জল দিতে কতক্ষণ লাগবে?

সরলার আসমানী রঙের শাড়ীর আঁচলেই তার মুখ মুছিয়ে, মুখে চোখে জল ছিটিয়ে এবং অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা বাঁচিয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে দিলে আর কতটুকু সেবা করা হয়? চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্য্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না! এমনি আশ্চর্য্য সেবা করার নেশা!

পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করে সত্যর হঠাৎ মনে হয়, মরবার কথা নয় বটে, কিন্তু যদি মরে যায়? সব বিষের ক্রিয়া তো সকলের ওপর সমান হয় না! যে বিষে একজনের কিছুই হয় না, সেই বিষে অন্য এক-জনের মরে যাওয়া আশ্চর্য্য কি? আর যদি জ্ঞান না হয় সরলার অপলক

চোখে আর যদি দৃষ্টি না আসে, বক্ষস্পন্দন যদি চিরদিনের জন্য থেমে যায়? অনেকেই জানে সে সরলার সঙ্গে ছিল, খোঁজ তার পড়বেই। সরলাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালালে পালাবার সময়টা সে একটু বেশী পাবে বটে, কিন্তু এই অবহেলার জন্য সরলা যদি মরে যায়, চোরের চেয়ে খুনীকে আবিষ্কার করার জন্য পুলিশের মাথাব্যাথাও হবে সেই অনুপাতে বেশী। ধরা পড়লে চোরের চেয়ে খুনীর শাস্তিটাও চিরদিন বেশীই হয়ে এসেছে।

সত্য জানে সরলার কিছু হবে না, কাল অনেক বেলায় জ্ঞান হয়ে টাকা আর গয়নার শোকে সে যদি হার্টফেল না করে। যে বিষ যতখানি সরলার পেটে গিয়েছে তার তিনগুণ বিষ পেটে গেলেও সরলার কিছু হবে না, কিন্তু যদি হয়? খুব কি দুর্ব্বল নয় সরলা, খুব নির্জীব? আজ পর্য্যন্ত যত মেয়েমানুষ সে দেখেছে, তাদের সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সরলার কম নয়? এমন কোমল এমন অসহায় জীব জগতে আছে?

ভয়ে সত্যর বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, নিস্পন্দ সরলার দিকে চেয়ে জগতে কারও যে মরবার কথা নয় সেই বিষটুকু সহ্য করবার মত শক্ত-সমর্থ সরলা নয় কেন ভেবে ক্ষোভে তার চোখে জল আসে। এত বেশী রাগ হয় যে, সরলার শিথিল অবসন্ন দেহটা বুকে তুলে তাকে পিষেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এতদিনের মৎলব যে এমনিভাবে ফাঁস করে দেয়, সেই তার উপযুক্ত শাস্তি। রাগটা খুব বেশী হয় বলে বুকে পিষে মেরে ফেলবার কথাটাই সত্যের মনে আসে, গলা টিপে মেরে ফেলবার সহজ উপায়ের কথাটা খেয়াল হয় না।

একে একে গয়নাগুলি সরলাকে পরিয়ে দিয়ে, তার টাকাগুলি যথা স্থানে লুকিয়ে রেখে, আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সে সরলার আরও জোরাল

সেবা আরম্ভ করে দেয়। যে অবস্থা ফিরে এলে সে যে বাঁচবেই এবিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, সে অবস্থাটা ফিরে আসতে কাল বেলা হবে—মেয়ে কি সহজ ননীর-পুতুল! সত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হ'ল না। যাক্, কি আর করা যায়, চুরি করার জন্ত খুনী হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্ত ব্যবস্থা করবে—আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবেনা সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে? যত দিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটুম্বর!

দিক পরিবর্ত্তন

মনোহরের এত পসার যে রোগীরা নাকি তার হাতে মরতেও ভালবাসে। মনোহরের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীর দোতলা আর তিনতলাটা বসবাসের কাজে লাগে, একতলায় বড় ডিস্‌পেন্‌সারী আর ওষুধের কারখানা। মনোহরের আবিষ্কৃত অনেকগুলি পেটেণ্ট ওষুধ আছে। কতকগুলি রোগের পক্ষে উপকারী সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ কতকগুলি ওষুধের সঙ্গে আরও কতগুলি মানুষের পেট, রক্ত, স্নায়ু প্রভৃতির পক্ষে উপকারী ওষুধ মিশিয়ে যে সব পেটেণ্ট ওষুধ সাধারণতঃ তৈরী হয় আর অসংখ্য বিজ্ঞাপনের জোরে অসংখ্য রোগীর উদরে প্রবেশ লাভ করে, মনোহরের ওষুধগুলি সাধারণতঃ সে-রকম নয়। তার ওষুধে প্রকৃত যেটুকু গুণ আছে আর সে ওষুধ খেয়ে রোগীর যেটুকু উপকার হয় সেটা মনোহরের অনেকদিনের চিন্তা, পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফল।

তাই পেটেণ্ট ওষুধ মনোহরের একটু বিক্রি হয় কম। তবু তার অভাব বলতে কিছু নেই। তার নিজের স্বাস্থ্য ও চেহারা মন্দ নয় এবং চরিত্র ভাল। তার বৌ যথাসম্ভব মোটা আর সুন্দরী। তার ছেলে-মেয়ে দুটি কচি ও মিষ্টি। ঝি, চাকর, দারোয়ান, কম্পাউণ্ডারে বাড়ী তার বোঝাই।

ওই যে ঝি, ওর নাম হ'ল সখি। সখির বয়স খুব কম এবং সে বিধবা। তার মনিব আছে কিন্তু মালিক কেউ নেই।

কিন্তু স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ সখির মত বয়সের—আইনসঙ্গত

মালিকের আসনটি শূন্য থাকলে আইন-অসঙ্গত ভাবে সে শূন্য আসনটি দখলের চেষ্টা করার লোকের অভাব মোটেই হয় না। চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে' ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডারের পর্য্যন্ত সখির সম্বন্ধে মনের বিকার।

ধর্ম্ম থাকে মন্দিরে, চার্চ্চে, মসজিদে—বিবেক থাকে হৃদয়ে। নীতিজ্ঞান সর্ব্বত্রই ছড়ানো। তবু যে মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েমানুষের নীতিজ্ঞানকে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই অনেকক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায় তার কারণ একজন মানুষকে জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্, আরেকজন মানুষের নৈতিক জীবনের চতুঃসীমানায়-গাঁথা দেয়ালটিকে খাড়া রাখতে হয়। 'কিছু'র জন্য নয়, আদমের আপেল খাওয়ার দিন থেকে 'কারো'র জন্য আমরা ভাল অথবা মন্দ অথবা মধ্যবিত্ত হয়ে থাকি।

সকলেই প্রলোভন দেখায় কিন্তু মনোহরকে সখি এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে তার মাইনে করা চাকরের প্রলোভন সে অনায়াসেই জয় করে' চলে। কম্পাউণ্ডার একদিন একটি পাঁচ টাকার নোট সখির আঁচলে বেঁধে দিতে গিয়েছিল, পারে নি।

অথচ, পাঁচটা টাকা সখির একমাসের উপার্জ্জন।

এমনি ভাবে দিন যায়। মনোহর মনোযোগ দিয়ে রোগী ছাখে, কম্পাউণ্ডার ওষুধ তৈরী করে, চাকর দৈনিক বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় বড়লোক হয়, ঠাকুর দু'বেলা ভাত র'াধে, দারোয়ান নিয়মিত গেট পাহারা দেয় আর সখি বাসন মাজে, কাপড় কাচে গিন্নীর ফাই ফরমাস খাটে। গিন্নি মোটরে চড়ে' বেড়ান আর মোটা হন।

তারপর একদিন মনোহর দুপুরবেলা ফিরছে 'কল্' থেকে, সারাদিন

রোগী দেখে' দেখে' বেচারীর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে; সখি তখন কলতলায় স্নান করছিল। রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাকর বিড়ি টানছিল, মনোহরকে দেখে সে সরে' গেল।

সখির দিকে চেয়ে মনোহর চমকে উঠল। সে যখন বাইরের রোদে ঘুরে ঘুরে তেতে পুড়ে সারা হয় তখন তারই বাড়ীতে উঠোনের ভিজে ছায়ায় সখি চুল এলো ক'রে দিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালে এটা মনোহরের কাছে কেমন অসঙ্গত ঠেকল। তার এত তৃষ্ণা পেয়েছে যে সখির চুলের সস্তা নারকেল তেল ধুয়ে যে জল গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাই পান ক'রে সে অনায়াসে তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

মনোহর অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্ক ভাবে স্নানাহার সম্পন্ন করল। বিকেলে সে আর রোগী দেখ্‌তে গেল না। সন্ধ্যার সময় গিন্নি আর ছেলে মেয়েদের সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়ে সখিকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। বলল 'আমার ঘরে একগ্লাস জল দিয়ে যাও সখি।'

জল? জলে কি মানুষের তেষ্টা মেটে?

পরদিন দুপুরবেলা সখি ডিস্‌পেনসারী ঝাঁট দিচ্ছে, কম্পাউণ্ডার এসে তার হাত ধরে' প্রথমে নিজের দিকে তারপর ডিসপেন্‌সারীর পাশে নিজের ঘরের দিকে আকর্ষণ করল। সখি বাধা দিল না। শুধু হাত পেতে মুচ্‌কে হেসে বলল, 'টাকা?'

রাত্রে তার রুদ্ধ দরজার সামনে মিনতি করতেই সে চাকরকে দরজা খুলে দিল। চাপা গলায় বলল, 'বাবু টের পেলে তোকে গুলি ক'রে মারবে।'

মসলা বাটছিল, ঠাকুর এসে চুপি চুপি বলল, 'একটা ঘর ঠিক ক'রে এসেছি। রোজ একবার ক'রে যাস্‌।'

ঝি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। মুখেও বলল, 'যাব।'

বাড়ীর কেউ তখনো ওঠে নি। বারান্দায় বসে' চুল এলিয়ে দিয়ে সখি আপনমনে কাঁদছিল। দরোয়ান তখন নেংটি পরে' মেহনৎ করতে আখড়ায় যাচ্ছে। ভেতরে এসে সে সখিকে জড়িয়ে ধরল।

সখি ক্লান্তস্বরে বলল, 'বাইরের দরজাটা বন্ধ করে এসো ছটু্ সিং। কেউ আসবে।'

মাস ছ'যেক পরে গিন্নি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সখিব ছেলে হবে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে তো এত অনাচার চলতে পারে না।

মনোহর গোপনে সখির হাতে শ' খানেক টাকা দিয়ে বলল 'যে ঘবটা ঠিক করে' দিযেছি সেখানেই থেকো। ছেলেটাকে যত্ন কোরো, মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসব।'

সখি বলল, 'পাঠিযে দেবে না নিজেই যাবো গো?'

মনোহর একটু দ্বিধা করে' জবাব দিল, 'আচ্ছা, নিজেই যাব।'

'সত্যি?' বলে' আড়ালে সখি চোখ মুছল।

মনোহর ক'দিন খুব মন খারাপ করে' রইল। যতই হোক, সখি যে তার ছেলেব মা!

কম্পাউণ্ডারটির ছেলে মেয়ে হযনি, বৌ বাঁজা। সে ভাবল, আহা, সখি যদি আমাব বৌ হ'ত। ছু'দিন পরে ও আমার ছেলেব মা হবে কিন্তু ছেলের সঙ্গে আমাব কোন সম্পর্ক থাকবে না!

ঠাকুর ভাবল, ইস্, ভারি অন্যায় হ'যে গেছে! বংশে একটা ফ্যাকড়া রয়ে' গেল। ছেলেটা যেন পেটেই মরে হরি!

চাকর কোত্থেকে একটা ওষুধের মোড়ক এনে বললে, 'খেয়ে ফ্যাল্। ও ছেলে দিয়ে করবি কি ?'

ঝি তার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে নর্দ্দমায় ফেলে দিল।

দরোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, বাঙালিনীর গর্ভে তার না জানি কি কিম্ভূতকিমাকার ছেলেই হবে! তার অমন গৌরবর্ণ, একটুও বোধ হয় বাচ্চাটা পাবে না।

ছটু্ সিং একটা ভজন ধরলে।

নদীর বিদ্রোহ

চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে রওনা করাইয়া দিয়া নদেরচাঁদ নূতন সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি চল্‌লাম হে !'

নূতন সহকারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নদেরচাঁদ বলিল, 'আর বৃষ্টি হবে না, কি বল ?'

নূতন সহকারী একবার জলে জলময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'আজ্ঞে না।'

নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষণ থামিয়াছে। পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই। নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মত ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। আকাশে যেমন মেঘ করিয়া আছে, হয়ত আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ধারায় বর্ষণ সুরু হইয়া যাইবে। তা হোক। ব্রিজের একপাশে আজ চুপ চাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না। পাঁচদিনের আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি না জানি নদীকে আজ কি অপরূপ রূপ দিয়াছে ? দুদিকে মাঠ ঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, রেলের উচু বাঁধ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুপাশে চাহিয়া চাহিয়া নদেরচাঁদ নদীর বর্ষণ-পুষ্ট মূর্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্য নদেরচাঁদের এত বেশী মায়া একটু অস্বাভাবিক। কেবল বয়সের জন্য নয়, ছোট হোক, তুচ্ছ হোক, সে তো একটা ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার, দিবারাত্রি মেল, প্যাসেঞ্জার আর মাল-গাড়ীগুলির তীব্রবেগে ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের সেও তো তাহাদেরই একজন, নদীর জন্য এমন ভাবে পাগল হওয়া কি তার সাজে? নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না। নিজের এই পাগলামীতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।

অস্বাভাবিক হোক, নদীকে এভাবে ভালবাসিবার একটা কৈফিয়ৎ নদেরচাঁদ দিতে পারে। নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে, নদীর ধারে সে মানুষ হইয়াছে: চিরদিন নদীকে সে ভালবাসিয়াছে। দেশের নদীটি তার হয় তো এই নদীর মত :এত বড় ছিল না, কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে, আর প্রথম যৌবনে বড়-ছোটর হিসাব কে করে? দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জ্জীব নদীটি অসুস্থ দুর্ব্বল আত্মীয়ার মতই তার মমতা পাইয়াছিল। বড় হইয়া একবার অনাবৃষ্টির বছরে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারাও প্রায় শুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।

ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে সে চাঞ্চল্য দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য যেন ছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। আজ যেন সেই নদী ক্ষেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেণোচ্ছ্বাসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণ নদেরচাঁদ একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষীণস্রোতা নদীর কথা

ভাবিতেছিল। তার চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্ত্তিকে তাই যেন আরও বেশী ভয়ঙ্কর, আরও বেশী অপরিচিত মনে হইল।

ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেণ্টে গাঁথা ধারক-স্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসিয়া সে প্রতিদিন নদীকে দেখে। আজও সে সেইখানে গিয়া বসিল। নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকস্তম্ভগুলিতে বাধা পাইয়া ফেনিল আবর্ত্ত রচনা করিতেছে। এত উঁচুতে জল উঠিয়া আসিয়াছে যে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়। নদেরচাঁদের ভারি আমোদ বোধ হইতে লাগিল। পকেট খুঁজিয়া পুরাতন একটি চিঠি বাহির করিয়া সে স্রোতের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল চিঠিখানা! উন্মত্ততার জন্যই জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল, তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়া চিঠিখানা যেন তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

দু'দিন ধরিয়া বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নদেরচাঁদ বৌ-কে প্রাণপণে একখানা পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখিযাছে, চিঠি পকেটেই ছিল। একটু মমতা বোধ করিল বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে খেলা করার লোভটা সে সামলাইতে পারিল না, এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল!

তার পর নামিল বৃষ্টি, সে কি মুষল-ধারায় বর্ষণ! ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম করিয়া মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইযাছে।

নদেরচাঁদ বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল, উঠিল না। নদী হইতে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উঠিতেছিল, তার সঙ্গে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ মিশিয়া হঠাৎ এমন একটা সঙ্গত সৃষ্টি করিয়াছে যে নদেরচাঁদের মন হইতে

ছেলেমানুষী আমোদ মিলাইয়া গেল, তার মনে হইতে লাগিল এই ভীষণ-মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের স্তিমিত আলো মিলাইয়া চারিদিক্ অন্ধকারে ছাইয়া গেল, বৃষ্টি একবার কিছুক্ষণের জন্ত একটু কমিয়া আবার প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল, ব্রিজের উপর দিয়া একটা ট্রেন চলিয়া যাওয়ার শব্দে আকস্মিক আঘাতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার মত একটা বেদনাদায়ক চেতনা কিছুক্ষণের জন্ত নদেরচাঁদকে দিশেহারা করিয়া রাখিল, তারপর সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড় ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্ত্তনাদী জলরাশির কয়েক হাত উঁচুতে এমন নিশ্চিন্তমনে এতক্ষণ বসিয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। হোক ইট, সুরকি, সিমেণ্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমন ভাবে ক্ষেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।

অন্ধকারে অতি সাবধানে লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নদেরচাঁদ ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিল। নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে। ব্রিজটা ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিকগতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু পারিবে কি?

পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে? আজ যে ব্রিজ আর বাঁধ সে ভাঙিয়া ফেলিবে, কাল মানুষ আবার সেই ব্রিজ আর বাঁধ গড়িয়া তুলিবে। তারপর এই গভীর প্রশস্ত, জলপূর্ণ নদীর, তার দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হইতে না জানি মোটে আর কতদিন লাগিবে?

ষ্টেশনের কাছে নূতন রঙ্-করা ব্রিজটির জন্য এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আজ তার মনে হইল কি প্রয়োজন ছিল ব্রিজের ?

বোধ হয়, এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই পিছন হইতে ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষিযা দিযা চলিযা গেল ছোট ষ্টেশনটির দিকে, নদেরচাঁদ চার বছর যেখানে ষ্টেশন-মাষ্টারী করিযাছে এবং বন্দী নদীকে ভালবাসিয়াছে।

মহাবীর ও অবলার ইতিকথা

একটি ছেলে ছিল আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ধরা যাক মহাবীর আর মেয়েটির নাম ধরা যাক অবলা। কার কত বয়স, কে কোন ক্লাশে পড়ে, এসব জেনে আমাদের দরকার নেই।

একদিন অবলা চোখ সজল আর বিস্ফারিত করে বলল, 'ছি!'

শুনে মহাবীর ভয়ানক ভড়কে গেল। একবার ভাবল হাত বাড়িয়ে অবলার একখানা হাত ধরে। ভেবে চিন্তে সে ইচ্ছাটা ত্যাগ করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, ছি কেন? কিসের ছি?'

'মাকে তুমি এমন করে অবহেলা কর!'

সত্য সত্যই অবলার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। কোমল মন কিনা, কারো দুঃখ কষ্টের কথা কানে এলেই মনটা গরমের দেশের বরফের মত গলে যায়। অবশ্য সবচেয়ে বেশী গলে নিজের দুঃখ কষ্টে; ঠিক গরম তাওয়ায় বরফ দেওয়ার মত, কিন্তু জীবনে এখনও দুঃখ কষ্টের আবির্ভাব ঘটেনি বলে পরের জন্ম মনটাকে একটু একটু না গলাতে পারলে অবলার দিন যেন কাটতে চায় না।

অবলার অভিযোগ মহাবীরকে আকস্মিক লজ্জায় প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল। কেমন যেন বদলে গেল ছেলেটা। পোষাকের চাকচিক্য উঠে গেল, খরচের বাহুল্য কমে গেল, অতিরিক্ত আলস্যটা দরকারী বিশ্রামের

চার ভাগের একভাগে এসে ঠেকল, না খায় সে আর সিগারেট, না যায় অবলাকে নিয়ে সপ্তাহে দুদিন সিনেমায়।

অনেক ভণিতা করে মাকে সে চিঠি লিখে দিল যে, মা, তোমায় আমি বড় বেশী অবহেলা করেছি, এই অধম সন্তানকে মাপ কর। বাকী জীবনটা আমি তোমার সেবা করে কাটিয়ে দেব।

'বাকী জীবনটা আমি মার সেবা করে কাটিয়ে দেব অবলা।'

অবলা তা' ভাল করেই টের পেতে আরম্ভ করেছিল। মনে হল কি যেন একটা ঘূর্ণিপাকে পড়ে আজকাল তার মাথা ধরার আর কামাই থাকছে না। মুখটা দেখাচ্ছে পাংশু, শরীরটা দেখাচ্ছে রোগা, কথাবার্ত্তা হ'যে গেছে ছাড়া ছাড়া। এমন একটা সাংঘাতিক ভুল কি সে করে বসেছে যার ফাঁদে পড়ে সারাজীবন ছটফট করতে হবে, এই কথাটা সব বয়সের স্ত্রীলোক অনেকবার ভাবে আর উতলা হয়। অবলা ঠিক সেইরকম ভাবে উতলা হতে আরম্ভ করেছিল।

একদিন তাই মহাবীরের সঙ্গে অতি সাধারণ বিষয়ে কথা বলতে বলতে আবার তার চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল।

'কাঁদছ কেন?'

হাতের ভাঁজে মুখ রেখে অবলা এবার রীতিমত কান্না আরম্ভ করল।

মহাবীর ভয়ানক ভড়কে গেল। ভেবেচিন্তে অবলার একটি হাত ধরে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে অবলা কাঁদছ কেন?'

অবলা কেঁদে কেঁদে বলল, 'তুমি কেবল মাকে নিয়ে মেতে আছ, আমার দিকে ফিরেও তাকাও না। আমি কি তোমার কেউ নই?'

কি সর্ব্বনাশ, অবলার মুখে এই অভিযোগ—অবহেলার!

মহাবীরের হৃদ্‌পিণ্ড যেন হঠাৎ কি একটা অজানা গ্যাসে বেলুনের মত ফেঁপে ফুলে উঠল। সত্যি, জীবনের কি শোচনীয় অপচয় ঘটেছে। অন্ধের মত সোনার খনি থেকে সে কি ভাবেই শূন্য হাতে বিদায় গ্রহণ করেছে !

মহাবীরের পোষাকে আবার চাকচিক্য দেখা দিল, খরচের বাহুল্য বেড়ে গেল, আলস্যের অতুলনীয় আনন্দে দিনরাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, একটা সস্তা দামেব পাইপ কিনে টানতে আরম্ভ করে অবলাকে নিয়ে সপ্তাহে তিনদিন সে সিনেমায় যেতে আরম্ভ কবল।

অবশ্য সেজন্য মাকে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হল, কিন্তু তার তো প্রতিকার নেই, তাই স্বাভাবিক।

অবলাব মন খুঁত খুঁত করে, মাঝে মাঝে চোখে জলও আসে, মহাবীরের মুখের দিকে তাকিযে মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবে।

ভাবে: মহাবীরেরা কি হয আকাশে ওঠে নয় পাতালে নামে, পৃথিবীতে থাকতে পারে না ? এই মাটির পৃথিবীতে ?

দু'টি ছোট্ট গল্প

বোমা

কাপড়ের দোকান থেকে সাতাশ টাকা দিয়ে স্ত্রীর জন্ম একখানা কাপড় ও ব্লাউস-পিস্ কিনে অক্ষয় ফুটপাতে নেমেছে, এক ভিখারিণী এসে সামনে হাত পাতল।

তার বয়স বেশী নয়। তার দিকে তাকিয়ে অক্ষয়ের মনে হল, বয়স বেশী না হওয়ার জন্যই ভিখারিণীর অসুবিধার সীমা নেই। পরণের কাপড়খানা তার মত জীর্ণ। অনেক কৌশল করেও সে পুরোপুরি লজ্জা নিবারণ করতে পারে নি। পথের লোকের দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিত হয়ে আছে।

বগলে স্ত্রীর জন্ম সাতাশ টাকা দামের কাপড় ও ব্লাউস পিসের কাগজের বাক্সটার স্পর্শ অনুভব করে অল্পবয়সী ভিখারিণীর দুর্দ্দশা দেখে অক্ষয়ের মন কেমন করে উঠল। পকেট থেকে একটা সিকি বার করে সে ভিখারিণীর হাতে দিলে। তারপর ট্রামের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দুদিকের ফুটপাত দিয়েই মানুষের সমান স্রোত চলেছে ভিক্ষা দুদিকেই সমান পাবার সম্ভাবনা। তবু রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ফুটপাতে যাবার কি দরকার ভিখারিণীর হয়েছিল বলা যায় না। অক্ষয়ের চোখের সামনে সে একটা দ্রুতগামী মোটরের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেল।

একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড, বীভৎস দৃশ্য। কিন্তু অক্ষয় আহতা ভিখারিণীর দিকে তাকাবার সময় পেল না। ভিখারিণীর লজ্জা নিবারণে অক্ষম শতজীর্ণ কাপড়ের ভাঁজ থেকে যে একরাশি চকচকে টাকা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

পার্থক্য

দুটি দেওরের সেবা-যত্ন করে বিধবা সুনীতির দিন কাটে। সুনীতির বয়স বছর তেইশ। বড় দেওর বিনয় তার সমবয়সী, বি, এ পাশ করে জুটমিলে চাকরী করছে। বিয়ের জন্য সুনীতি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে আগামী অঘ্রাণের মধ্যে দেওরের সে বিয়ে দেবেই। ছোট দেওর পাঁচুর বয়স বছর বারো। স্কুলে পড়ে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চঞ্চল ভাবে বাইরে আসতে গিয়ে চৌকাটে পা বেঁধে পাঁচু দড়াম্ করে একটা আছাড় খেল। সুনীতি ছুটে এসে তাকে তুলল। পাঁচুর খুব লেগেছিল। কোলে নিয়ে বসে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে সুনীতি তাকে শান্ত করল।

পাড়ার সরকার গিন্নি একটু তেলের চেষ্টায় বসে ছিলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বৌ, দ্যাওর তো নয়, পেটের ছেলের বাড়া।

পাড়ায় সুনীতির সুখ্যাতি রটল। দেওরদের সুনীতি মার মত স্নেহ করে, দিবারাত্রি দেওরদের জন্য খেটে খেটে তার জীবন বেরিয়ে গেল। সবাই বলল, হবে না? লক্ষ্মী বৌ যে!

কয়েকদিন পরে বিনয় জ্বর গায়ে আপিস থেকে বাড়ী ফিরল। জ্বর বেশী হয়নি কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়েছে। সুনীতি

তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল। বিছানায় শুয়ে বিনয় ছটফট করতে লাগল। সুনীতি বিছানায় বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মুখের দিকে ঝুঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল, খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই ?

বৌ কইগো ? বলতে বলতে সরকার-গিন্নি উঁকি দিলেন। পরক্ষণে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি গেলেন পালিয়ে। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল। সবাই বললে, আ ছি ছি, একি অলক্ষ্মী বৌ ?

সরীসৃপ

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতালা বাড়ী। জমি কিনিয়া বাড়ীটি তৈরী করিতে চারুর শ্বশুরের লাখটাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টন্‌টনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোন দিন কোন দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বেশ ভাল মানুষের মতই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়তঃ, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানা রকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি-সাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্ব্বনাশের পথ খোলা রহিল সে দিকটা লাভ করিল

তাহার উদাসীনতা ; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্ত ভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে তাহার বাঁচানোই ছিল উচিত তাহার মত বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই না থাকা।

কোন লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতের বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনের বৎসরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার বারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোট দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, 'বৌমাকে পাহারা দিস বুনো।'

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বৌ বলিয়া নয়, স্ত্রী-জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়ীতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চাকর-দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়ীতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত

এবং কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ী ছাড়িয়া যায় জন্ম মন কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মত তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত 'চুপ্ চুপ্! বাবার হুকুম।' এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মত ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, সহরের ভিতরে একটা বাড়ী করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোন সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনি উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, 'ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ী তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্ব্বস্ব গেছে, যাক, কি আর করব ;—সবই মানুষের কপাল। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।'

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ্য করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল,—'নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না, ভাই?'

'বেশ লাগছে।'

চারুর ছোট বোন পরী এক মাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়াছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভাল লাগিতেছিল না! এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, 'এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালী দাদা। ডালনা নিশ্চয় ভাল হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতে আমাকে রাঁধতে দিলে!'

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাবু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না?'

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা একথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি!'

চারু একটু হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নে, না করিস না করিস। একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দু'টো কথা বলতে দে।'

'আমিও কথাই বলছি।'

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের

সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার?' বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, 'দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্ত্তা? আমি যেন ওর ইয়ার! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।'

বনমালী বলিল, 'ছেলেমানুষ, বোঝে না।'

'বোঝে না? হুঁঃ, কচি খুকী কি না, বোঝে না! বোঝে সব, সব বুঝে ও এমনি করে, এ আর আমি টের পাইনে! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট্ বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয় নি!'

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সী পাটের দালাল।

খানিকপরে চারু বলিল, 'যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ী আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়ীটা নিয়ে নেবেনা, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কি সর্ব্বনাশ হত বলত!'

'তা বৈকি। বাগানবাড়ী পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ীতো তুমি বাঁধা রাখো নি চারুদি, বিক্রী করেছিলে।'

'ওমা, সে কি ? বাড়ী আমি বিক্রী কবলাম কখন ?'

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, 'দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো। তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার ফাঁস বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ী বিক্রি করেছ। ববাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।'

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ কবিতে পারিল না। কি বলিবে হঠাৎ সে ভাবিযা পাইল না। শেষে বলিল, 'তুমি হাসছ, তাই বল !'

বনমালীর মুখেব হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামী মনে করিযা থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহিব করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, 'আমি বলি কি, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ী দিয়ে তুমিই বা করবে কি ; তার চেযে বিক্রি কবে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিযে নাও, বাকীটা আমাকে দাও। তোমার তিরিশ হাজাব কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিযে দেশে একটা ছোটখাট বাড়ী তুলে বাস করিগে। জমি যায়গা যা আছে দু'চাব বিঘে তাব খাজনা পাইনা ফসল পাইনা, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।'

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোন কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখী হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও

না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়ী বিক্রি করতে চাও? ক্ষেপেছ!'

চারু সভয়ে বলিল, 'কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে!'

'আমার টাকা চুলোয় যাক।'

চারু আরও ভয় পাইয়া বলিল, 'রাগ ক'রোনা ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝিনে!'

বনমালী বলিল, 'ভুবনের বাড়ী বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে? ওসব দুর্ব্বুদ্ধি ক'রোনা। সময়টা, কি জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়ীটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।'

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, 'তারপর?'

'ভুবনের বাড়ী ভুবন ফিরে পাবে।'

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, 'কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?'

'ভুবনের কাছে জমা থাকবে!'

একথা কেহ বিশ্বাস করে! নির্ম্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, 'কেঁদোনা চারুদি। আমি কি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালবাস্তে।'

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আর কোন আশা নাই।

'আমি যদি তোমার মনে কোন দিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—'

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

'তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?'

চারু চোর বনিয়া গেল—'যদির কথা বলছি।'

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ভুবন কোথায় চারুদি?'

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, 'ও ভুবন, ভুবন। একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।'

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপ থুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভাল বাসে, চারু তো আশ্চর্য্য মেয়েমানুষ!

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'আর আসব না দিদি।'

আরও একমাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস দাসী ও মোট-বহর লইয়া সহরের ভিতরের বাড়ী ছাড়িয়া চারুর সহরতলীর বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?'

বনমালী বলিল, 'অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কি করে, চারুদি? সে জন্ম নয়। মনে করছি, বাড়ীটা আগাগোড়া মেরামত করব

আর দু'খানা ঘর তুলবো ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।'

চারুকে বলিতে হইল,'আহা আসবে বৈকি, সেকি কথা, বেশ করেছ।'

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ী মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ী বনমালী দুইশত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ ত্রৈলোক্য অধিকার সদরের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, 'অসুবিধে হচ্ছে, চারুদি?'

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়!

'না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।'

'কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বৈকি!'

'দেশে কি বাড়ী ঘর দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব?'

'হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ী হয়। জমি জায়গা আছে, খাজনা পাওনা, ফসল পাওনা, সব লুটেপুটে নিচ্ছে; নিজে থাকলে লোকসানটা বন্ধ হত।'

'জমি! জমি কই দেশে? কিছু কি আর আছে ভাই আমার সর্ব্বস্ব গেছে।'

বনমালী তখনকার মত চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, 'হাঁরে, ওরা কি যাবে না?'

'কোথায় যাবে?'

'যে চুলোয় খুসী, আমাদের তা ভাববার দরকার? ক'দিন থাক্, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।'

'তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ওসব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।'

কয়েক দিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, 'শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও? আমায় বলনি কেন চারুদি'? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মে আমি বাধা দেব কেন?'

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ী হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্ব্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে একপরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, 'কই তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মামীকে বলছিলাম, স্বামী শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার একপাও কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসীমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?'

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভাল লাগে না।

'তবু, দেশ-বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হ'ত।'

'হায়রে কপাল, ওর আবার দেশ-বেড়ানো!'

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কি আর হইবে, থাক্। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদি'র ভারটা আর এমন কি গুরু!

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দু'টি কচি সবুজ ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাই-এর মত তাদের দু'টিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত!

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো। কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে!'

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, 'আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।'

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'অমন করে কাঁদিসনে পরী; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।'

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

'ওকে এখন ওসব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি ও একটু কাঁদতেও পেরেছে রে! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে [illegible] কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।'

পরী আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, ত্যাখো কি নির্ম্মম; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না!

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম নিয়া পরী বলিল, 'ও মাসীমা, দিদি কি করছে দেখুন।'

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

'ধরতো দেখেই আসি একবার।'

বনমালী হাত বাড়াইল না।

'আমি দেখে আসছি।'

'তুই এখানে বোস।' পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে এক রকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে নিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এসব তাঁহার ভাল লাগে না,—সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি। তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্ব্বদা তাহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোন প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁঝে শেষে কি তাঁহার তালু জ্বলিবে!

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, 'দরজা খোলো মা দরজা খোলো, ওসব কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মত চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজী তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, 'খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।'

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, 'তোর ছেলেটাতো বেশ হয়েছে রে!'

'থাক্, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।'

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সঙ্গত; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনদিন বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ্য করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মত দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

'তোর ঘাড়ে কি লেগে আছে রে, পরী?'

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, 'কি লেগে থাকবে? কিছু না।'

'তুই পাউডার মেখেছিস্?'

পরী জোরে নিশ্বাস নিয়া বলিল, 'মেখেছিইতো, একশবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন ?'

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন্ কারণে তাহার বুক সর্ব্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমত বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, 'আমার মত অবস্থা মাসীমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনদিকে কূলকিনারা নেই মাসীমা, আমি অকূলে ডুবেছি।'

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কি করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

মাথা চারু ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে নিয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোনদিক সামলাইবে ?

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু রেখে গেছে ?'

'না।'

'কিছু না ? পোষ্টাফিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায় নি ?'

'কি রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি ? মাস গেলে হাত-খরচের টাকার জন্ম বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে !'

'আমি যা দিয়েছিলাম ?'

'শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাটপালঙ্ক ছাড়া।'

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তোর গয়নাও দেয়নি নাকি? তোকে যে আমি তের চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে!'

'কিচ্ছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্স খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্য্যন্ত।'

'এমন চামার! তা, আর দু'টো মাস তুই ধৈর্য্য ধরে থাকলি না কেন? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।'

'বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভাল লাগল না।'

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, 'থাকতে ভাল লাগল না! মেয়েমানুষের অত ভাল লাগা মন্দ লাগা কিলো, যা, কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।'

পরী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'আছে, ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে? তাদের দিয়ে যেতে হবে না? ও বাড়ী আমি আর যাচ্ছি না বাবু, হ্যাঁ।'

চারু আগুন হইয়া বলিল, 'ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি? তোকে খাওয়াবে কে শুনি? আমি! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।'

'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি', বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি! ভাবতে হবে নাতো আমার বাড়ীতে এসেছিস কেন লো হারামজাদি?'

তিন দিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর

কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

'ত্যাখ পরী, এত বাড় ভাল নয়।'

'নয় তো নয়, কি হবে?'

'খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি?'

'সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।'

চারু বনমালীর শরণ নিল।

'মেয়েটা নিজের সর্ব্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।'

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, 'আহা, যাবে বৈ কি চারুদি, যাবে। দু'দিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কি?'

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল, 'লেগেছ তো পেছনে? জগতে কারো ভাল করতে নেই।'

'তুই আবার কবে আমার কি ভাল করলি লো?'

'এখানে আছ কার জন্য? ভেবে দেখেছ একবার?'

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোর জন্য, না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস্!'

'তাই।'

চট্ করিয়া ঘুরিয়া দম্ দম্ পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না; এই তিন সত্যি করলাম নারায়ণ সাক্ষী।'

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশীদিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশী কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলে, 'খান, পেট আপনার ভরে নি। কখ্খনো ভরে নি। আমি বুঝি না! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?'

বলে, 'কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন বেশ রাঁধি।'

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিক্তিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আব্দারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, 'হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও! খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভাল হবে?'

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্ব্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু'চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হাল্কা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কি করছেন।'

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপি চুপি ঘরে আসে।

বলে, 'কি চাই বলুন।'

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, 'পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।' পরী বলে, 'কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানি নে?'

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয়; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, 'যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস্ কেষ্ট।'

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীব হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত বচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কি মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে!

একদিন একটু বেশী রাত্রে খুব বাদল নামিযাছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল; প্রকৃতির সে এক মহামাবী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজ-খবর নিলে পরী খুসী হইবে। বনমালীকে ও যে-রকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুসী রাখা দরকার বৈ কি!

নিশুতি রাত, বাড়ীটা এক একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইযা উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কি জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে!

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের

মধ্যে দু'পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘ-গর্জ্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোট বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কি বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন-ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দরোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্য্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চিড়্ খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল,

একি মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্য্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া নিল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে!

হয়ত ভুবনকে না দিয়া এ বাড়ীটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, 'ভুবন আর বাড়ী দিয়ে করবে কি চারুদি? পরীকেই দিয়ে দিলাম।'

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া-আসা টের পাইযাছে। পাক্ টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোন কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দু'টা উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন্ দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাওয়ায় তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ীর ঝিএর চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়ীতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক্, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে।—যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ

করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বার বার ভাবিয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ নিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ীর গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণী দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এমন ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করিল এর আকস্মিকতা এর অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাৎ ছেলেমানুষী খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ও সব পাগলামী চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারো মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যে দিকে যে ভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কি আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয়

করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কি কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোন আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই! তার নৈকট্যকে, তার নির্ব্বাক আবেদনকে, তার দু'চোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত!

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সেই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভাল ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু'তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই সুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। এর কোনটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনি অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন—এরকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল 'নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।'

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়া আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া নিয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনও আর একজন বাকী।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

একমুহূর্ত্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী এক রকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, 'কি বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল!'

বনমালী বলিল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'হ্যাঁ। ক'দিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।'

বনমালী আচমকা বলিল, 'ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?'

চারু মাথা নাড়িল।

'কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কি? হুট্ বলতে ও যেখানে খুসী যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়া মমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—'

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, 'ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোন, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী কবাব কি দরকার কে জানে! কথা কি শুনবে মেয়ে! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা দেখো ভাই।'

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটা আস্ত বাড়ী ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবাব সে সোজাসুজি যাত্রী-নিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত কবিযা সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তার ফিবিয়া যাওযার আগেই পরী যেন কলেরা হইযা মরিয়া যায। পরীর যে আর বাঁচিযা থাকার দরকাব নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভাল করিযাই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে? পরীব ছেলেকে সে মানুষ কবিবে।

তৃতীয দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিবিযা চারু দেখিল, একটি বৌ এর কলেরা হইযাছে। তাকে বিদায কবিবার ষড়যন্ত্র আর পলাযনপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বৌটিব সঙ্গে চারুর পরিচয হইযাছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওবকে সঙ্গে নিযাই মরিয়া হইযা সে ধর্ণা দিতে আসিযাছে। বৌটির নাম কনক, বযস অল্প; থুপ থুপ করিযা পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মত!

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিযা সকালে চারুর কাছে একটি

পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বৈকি!

'হ্যাঁ মাসীমা, ক'দিন থাকবেন আপনি?'

চারু হিসাব করিয়া বলিল, 'আজ নিয়ে হ'ল তিনদিন, আরও পাঁচ ছ'দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়! কিন্তু দেখি ক'টা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্ন আত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখেনে, পা গুটিয়েই বোসোনা, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কি ভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কি করে জানব? এতকাল একটা জমিদারী চালিয়ে এলাম, আমার কি ওসব ভুল হয় বাছা? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।'

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়ীতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ী মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চ্চা নিয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, 'আপনি তাহ'লে আছেন ক'দিন? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসীমা। বাবার দয়া হতে দু'দিন লাগে কি তিনদিন লাগে ঠিকতো কিছু নেই, একা কি করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—'

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'মাসীমাকে প্রণাম কর শিশু।'

কাল কনক ধর্ণা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ।

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীনিবাসের কর্ত্তা একটা গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, 'যাওনা হে ছোকরা, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি? আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোন ভয় নাই—আমি বলছি কোন ভয় নেই। রুগী হাঁসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্য্যন্ত ডিসেনফিট্ করে দিচ্ছি।...আপনাদের যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন!'

'হলে আর তোমায় বলে কি হবে বাপু?' এই ধরণের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্ত্তা চোখ লাল করিয়া একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোন জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ী আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

'মাসীমা, দেখুন না এরা জোর করে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না?'

চারু বলিল, 'তা যাওনা বাছা, হাঁসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়?' তারপর ভৎ'সনা করিয়া বলিল, 'এখনো একজন ডাক্তার ডাকনি, করেছ কি? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা।' বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ী নিয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমার পাথরের বাটিটা?'

'বাটিটা বৌদি নোংরা করে ফেলেছে, মাসীমা।'

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেন নোংরা করেছে? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাবু। আচ্ছা, যা করেছে বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও।'

'একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।'

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, 'দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ী ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।'

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরণের কাপড় মাটীতে বিছাইয়া বলিল, 'এইতে দাও' অনেক পরত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু সেটা আলগোছে তুলিয়া নিল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া নিয়া চোরের মত কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া ধূলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্ম্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, 'এক হাতে নয়, দু'হাতে ধর। ছেলের মা তুই তোর ত সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।'

'ছুটো ভাত যে দিদি।'

'ভাত নয় প্রসাদ, খা।'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্ম্মাল্য পান চাহিয়া দেখিল। তারপর

বাটিটা নিয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোকে সকলে ভালবেসেছে ভুবন?'

ভুবন অস্বীকার করিল।

'তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কি রকম দেখলি বলত!'

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার ভাগ্নেকে ঠিক সময় মত না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুর বেলা ভুবন চুপি চুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

'কি জান মা, মার মত কেউ কি করে?'

চারু বলিল, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কি হবে? মারধর করেনি ত কেউ?'

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

'না মারধর কেউ করে নি।'

চারুর পুরানাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরাণী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়। মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষ ভাবে সুন্দরী দেখিল,—অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল।

ভাবিল, 'না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বৈ ত নয়।'

শরীরটা চারুর ভাল লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোন মতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায় ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বৌটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিন ঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবতঃ মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিযাছিল, চারু কাঁদিয়া তাকে বলিল, 'ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শীগগির।'

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল একঘণ্টা পরে। ইতি মধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড় বিড় করিয়া আপন মনে কি যে সে বকিতে লাগিল কেহ তার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক

বনমালী বারকত তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্ম তার কোন ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।

পরীর মনে হইল তারও কিছু বলা দরকার।

'ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনো।'

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে! চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধ হয় ক্ষমতা নাই সে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

ক'দিন পরী খুব কাঁদিল। 'দিদি আমায় বড় ভালবাসত', এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

'একদিনের তরে সুখ কাকে বলে জানে নি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে।' বনমালী বলিল, 'শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।'

পরী বলিল, 'হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।'

'অথচ একটু যত্ন হয় নি।'

'না। নিলে তো কারো যত্ন! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্ম খেটে খেটে প্রাণটা দিয়েছে।'

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, 'বড় খা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কি বল?'

'হলে না কেন ?'

পরী হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ; আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে ? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব !'

বনমালী বলিল, 'তাই নাকি !'

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনো পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া নিল। ছোট একটি পান সাজিয়া মুখে নিয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

'শোন। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিং-বোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো ?'

'আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারি কাঁদছে পরী।'

'পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।'

'পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।'

'আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয় !'

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

'না সাজলেই তোকে ভাল দেখায় পরী।'

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া নিল। চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোকে না পাঁচশো বার বলেছি বাবুর ধারে-কাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না ?'

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, 'বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, 'খোকাকে আনত পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।'

'মরণ তোমার! ভয় আবার কিসের?'

'তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু! দেখলে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই এ্যাদ্দূর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।'

পরী হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস্। তার পর কি হল বল।'

'ভয়ে ভযে খোকাকে তো নিযে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্য্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, নারে পদ্ম? লজ্জায় মরি দিদিমণি।'

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, 'আচ্ছা, পবের ছেলেকে তুমি এত ভালবাসলে কি করে বল ত? তোমার হিংসা হয না?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কি? বরং তোর ছেলে বলে ভালই বাসি।'

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

একি পবিণাম! সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক!

আর্সি কি প্রত্যহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কি করিয়া? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আর্সিতে নিজেকে তাহার প্রত্যহ নূতন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এর মধ্যে পুরানো হইয়া গেল? মাথার না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায়?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনো চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড় মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোন স্তবই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্ম ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুত গতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিযা নেব। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনি অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রস-বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিযা শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জয় করিবাছিল চারু।

চারু তার প্রথম বয়সের নেশা ; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারী-মনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহ মন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমত তাহাকে নিয়া খেলা করিত ; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মত চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মত প্রতিভা নাই। বনমালীর পাক-খাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া নিতে পারিলনা।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিসের নীচে জুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রাব বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মত পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মত বলিতে থাকে, 'শোধ নিস্, শোধ নিস্; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস্।'

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, 'কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা!'

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে এ বারান্দা ও বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্য্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে সে ডাকিয়া তুলিল।

'ভুবন কি রকম করছে দেখবে চলো।'

'কি রকম করছে?'

'কাঁদছে আর ছটফট করছে।' অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, 'প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে?'

'আমি।'

বনমালী সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, 'ত্যাখো তো কি করলে! নিভিয়ে দাও।'

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না। 'ঘরে যাও' বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

'কে রে? পরী নাকি? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কি করছিস পরী?' বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, 'মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে!'

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'একি কাণ্ড মা! এঁ্যা?'

পরদিনটা কোনরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, 'পরীকে এবার পাঠিয়ে দে বনমালী।'

'দেব। এখন থাক্।'

পরীকে এখন সে অবহেলা কবিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারি মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেননা, তিনি আবার বলিলেন, 'না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক্, স্বামীব ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস্?'

বনমালী হাই তুলিযা বলিল, 'দু'টি খায়, ও আবার বোঝা কি মা?'

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনীব মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিযা উদ্ধাব করিবেন শুইযা শুইযা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দু'দিন পরে আবাব বলিলেন, 'যে বাগী মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয়না বাবু। কিন্তু চোখ মেলে এতো আর দেখা যায় না বনমালী!'

'কি হয়েছে?'

'রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না। আমার রাগ হবে না, বল।'

হেমলতা গলা নীচু করিযা বলিলেন, 'পরীর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় বনমালী। মেযে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস্? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল?'

'জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুর বেলা সেদিন চোরের মত পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক চেয়ে ওদিক চেয়ে নীচে নেমে গেল।'

'কবে ?'

'পরশু।'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'পরশু তো ? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারী চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরোনা মা। পরী সে-রকম নয়।'

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোস গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওযার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত। আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলেব ভাল করিতে যাওয়া কি তাহার সাজে ?

এদিকে, বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মত জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝেনা, দিনরাত আগের অবস্থা ফিবাইযা আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, 'অভিমান করে গম্ভীর হযে থাকব ? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব ? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকব ? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব ? পায়ে ধরে যে-দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব ?'

এর মধ্যে শেষ কল্পনাদুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালবাসে।

অন্ততঃ তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোন কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, ভুবনকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে নিয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মত একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারী সুখী।

বলে, 'ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।'

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, 'আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে এ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও।'

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, 'যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।'

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত!

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া নিতেছেন।

বনমালী বলে, 'আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।'

হেমলতা বলেন, 'আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস্।'

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বার বার হলঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে ছটা বাজিতে চলিল কি করিয়া?

ঘড়ির ডায়লটা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারি কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, 'ভেঙে ফেলে দেব, পাজী কোথাকার !'

ঘড়িতে ছ'টা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগান ছুটিয়া যায়। বলে, 'ছ'টা বাজল মামা।'

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায়না।

বনমালীর এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি হয়। ছ'টার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মত ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়ত কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে ? তাহাকে একটু খুসী করার জন্য। কোন প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোন মতলব হাঁসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুসী করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য !

ভুবনকে সে যে ভাল বাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরও একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত ; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মত ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য

ছটফট করিয়া কাঁদে; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, 'একটা বাড়ী নিবি, ভুবন?'

'নেব মামা!'

'আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ী লিখে দেব।'

এ বাড়ী অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোট বাড়ী সম্প্রতি এক প্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়ীটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরীতো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়ীটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিতা কুক্কুরীর মত অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মত বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে

হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্ম তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাসিতে কাসিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, 'কি করে এমন হ'ল দিদিমণি?'

পরী ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'বাবুর কীর্ত্তি পদ্ম। অন্ধকারে—'

পদ্ম চোখ মিট মিট করিয়া বলিল, 'সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। ছুঁচো বেড়ালটার হয়েছিল দেখনি? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুঁযে বক্তে—!'

* * * *

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাকে নিয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপি চুপি ভুবনকে বলিল, 'মার কাছে যাবি, ভুবন?'

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, 'যাব।'

'এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ী চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।'

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

'মামাকে বলে যাই?'

'তবেই তুমি গিয়েছ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস্? ছাই দেবে!'

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্ম প্রস্তুত হইয়া নিল।

পরী বলিল, 'কাউকে কিছু বলিসনে কিন্তু, খবর্দ্দার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।'

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে নিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীর পিছনদিকের গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হন হন করিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউণ্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্য্যন্ত ফার্ষ্ট ক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ী ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

'যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ী থামবে সেইখানে নেমে যাবি।'

ভুবন বলিল, 'আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসী।' পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'মামা দিয়েছে। ক'টা বেজেছে জানো? তিনটে বেজেছে।'

'ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ী না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস্ কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।'

ভুবন বলিল, 'আচ্ছা'।

রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার

কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস্? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো? ভাঙ্গিয়ে কাল খাবার কিনিস।'

'মা ষ্টেশনে আসবে, মাসী?'

'আসবে।'

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

'খোকাকে দাওনা মাসী, একটা চুমু খাই।'

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

'না না, এখ্খুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।'

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ী ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

'ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?'

'ভুবন? ভুবনের আমি কি জানি! বাড়ী নেই?'

বনমালী হাঁকিল, 'কেষ্ট এদিকে আয়।'

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

'তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।'

কেষ্ট কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'কেন বাবু?'

'রাত দুপুরে তুই দোতালায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস্ বলে। আমার ন'শো টাকা চুরি গেছে।'

ঝি চাকর আশ্রিত ও আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?'

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

'ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।'

দোতালায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া-মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, 'এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।'

নীচে ভাঁড়ারের পাশে একসারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়ীতে যাদের স্থান ঝি চাকরেরও নীচে বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমি কি করেছি? তোমার গা ছুয়ে বলছি—'

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় নিয়াছে।

পরীকে নীচেই যাইতে হইল।

ক্ষেস্তি বলিল, 'কি গো, ওপোর থেকে তাড়িয়ে দিলে ? বড়লোকের মর্জ্জি দিদি, কি করবে বল।'

পরী বলিল, 'কি যে বল তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে ? আমি যেচে এসেছি। ওপোরে যে সব ম্লেচ্ছাচার—বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষালো না।'

ক্ষেস্তি বলিল, 'ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ী তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল! আজ যে রাণী, কাল সে দাসী। হায়রে কপাল!'

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেস্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন ? সয়ে যাবে।'

বলিয়া সে পরীব বিছানাতে বসিল।

'শোন বলি। কলকাতার সে বাড়ীতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—'

পরী বাধা দিয়া বলিল, 'থাক্। তুমি যাও।'

'শোনই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ীর রাজা আমাকে বললে, নীচেটা স্যাঁতসেঁতে তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—'

ক্ষেস্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হাল্কা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোক গিলিয়া সে বলিল, 'ব্যাপার বুঝে আমি রাজী হলাম না। নীচে মার কাছেই রইলাম।'

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, 'আমার জ্বর আসছে তুমি যাও ভাই।'

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে, ভুবনের কোন খোঁজ করলি না?'

বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।'

ঠিক সেই সময় মাথার উপর ।.যা একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

শেষ